ISSN-1813-0372

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১

প্রকাশনায়	:	বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**
প্রকাশকাল	:	জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫
যোগাযোগ	:	বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০ ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com web : www.ilrcbd.org
সম্পাদনা বিভাগ	:	০১৭১৭-২২০৪৯৮ e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
বিপণন বিভাগ	:	ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭ e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
		সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং MSA 11051 বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি: পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ	:	ল' রিসার্চ সেন্টার
কম্পোজ	:	ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম	:	১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

'ইসলামী আইন ও বিচার' একটি গবেষণাধর্মী ইসলামী জার্নাল। এর প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধ গবেষণামূলক। সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে এবং কুরআন, হাদীস ও যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সমাধান উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ জার্নালে যাদের প্রবন্ধ ছাপা হয় তাদের অধিকাংশই উঁচু মানের গবেষক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জার্নালটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং একটি গবেষণা জার্নাল হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতিও লাভ করেছে। জার্নালটির উপদেষ্টা ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সকলেই লেখক ও গবেষক হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতিমান। আশা করি এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাবে।

জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে যার প্রত্যেকটির বিষয়বস্তু সময়োপযোগী। যেমন 'কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার' বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজ যারা শিশু-কিশোর তারাই একটি দেশ ও জাতির তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। মানবিক দিক দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নতি এবং সুস্থ মন-মানসিকতার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি। শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। আল্লাহর রাসূলের স. ভাষায় কথাটি এমন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

'প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাবধর্ম ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহূদী অথবা খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।' [সহীহুল বুখারী-১৩৮৫] অর্থাৎ তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাকে স্বভাবধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে। ফলে শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। প্রতিটি শিশু-কিশোরের সুশিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার কারণে আজ সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উপরোক্ত বিষয়টি সামনে রেখে প্রবন্ধকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর অপরাধের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় বিচার-বিশ্লেষণ করে সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি যে সময়োপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানুষ যুগে যুগে সে সকল শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্থাপত্য শিল্প। কারণ মানুষ এ পৃথিবীতে আসার পর হতেই ঠাণ্ডা-গরম, ঝড়-বৃষ্টি, এবং পশু-পাখির আক্রমণ হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য এ শিল্পের প্রয়োজন বোধ করেছে। তা ছাড়া সমবেতভাবে উপাসনা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির জন্যও এর প্রয়োজন হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন মিসরীয়, ব্যবলনীয়, গ্রীক, রোমান প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী এই শিল্পের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। তবে তারা তাদের চিন্তা-বিশ্বাসের স্বকীয়তা ও নিজস্বতা বজায় রেখে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করেছে। ইসলাম এ শিল্পকে কোন দৃষ্টিতে দেখে এবং মুসলিম জাতি কিভাবে এর চর্চা করবে তা একটি পর্যালোচনার বিষয়। 'ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ বিষয়ে লেখা একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। কুরআন-হাদীস ও মুসলিম মনীষীদের মতামতের আলোকে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'ফাত্ওয়া' এমন একটি শব্দ যা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মাঝে অতি প্রচলিত। কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানার জন্য ফাত্ওয়া দেয়া-নেয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক একটি বিষয়। যারা জানে না তাদেরকে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার জন্য কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ফাতওয়া দেয়া কোন আনাড়ি ব্যক্তির কাজ নয়। এক্ষেত্রে মুফতী তথা যিনি ফাতওয়া দেবেন তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা এবং এতদসংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা অতীব জরুরী। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ ব্যক্তিবর্গের ফাত্ওয়ার কারণে বহু ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানবাধিকারও ক্ষুণ্ন হয়। কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এমনই একটি ঘটনা উচ্চ আদালতের দৃষ্টিতে আসে। সম্প্রতিবিজ্ঞ বিচারপতিগণ কিছু নীতিমালার ভিত্তিতে ফাত্ওয়া দান বৈধ বলে রায় প্রদান করেন। 'ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সম্প্রতি প্রকাশিত সুপ্রিমকোর্টের রায়ের আলোকে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সহজ ও সাবলীল ভাষায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ফাত্ওয়া দেয়া যে সবার কাজ নয় এবং এর উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রবন্ধকার সে কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যে সম্পর্কে ইসলামের বিধান পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ইসলামের রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রায় সকল দিক-নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ স. ও খিলাফতে রাশেদার শাসনামলে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এ সময়টা ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মডেল হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি কেমন হবে তার একটি চিত্রও উক্ত সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। 'ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার বিষয়টি উল্লিখিত মডেল-এর আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বা সুন্নাহ বলে। এই হাদীস হলো ইসলামী আইন তথা জীবন বিধানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। আল-কুরআনের পরেই এর স্থান। এটাও এক প্রকার ওহী। কারণ, রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত যেমন কোন কিছু বলতেন না, তেমনি কোন কাজও করতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى–إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন তা শুধুই ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।' (সূরা আন-নাজ্‌ম, আয়াত : ৩-৪) তাই রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবনকাল থেকে নিয়ে পরবর্তী কালের কয়েক শত বছর পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী এই হাদীস সংরক্ষণের জন্য জীবনপাত করেছেন। এই হাদীসকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের বহু শাখার উদ্ভব ঘটেছে, যাকে উলূমুল হাদীস নামে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ হাদীসশাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের শাখা সমূহ। এসকল জ্ঞান নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি কখনো বন্ধ হয়নি। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে। বিশ শতকের এমনই একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ হলেন নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.। হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিশাল অবদান রেখে গেছেন। 'হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতির ক্ষেত্রে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান' শিরোনামে তারই একটি চমৎকার পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

আধুনিক যুগে মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথেই মানবাধিকারের ধারণাও বিকশিত হয়েছেআধুনিক যুগে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কল্যাণকামিতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত। বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আসলে এসব সনদ ও ঘোষণার বহু পূর্বেই ইসলাম মানবাধিকারের ঘোষণা কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে অসংখ্য স্থানে বর্ণনা করেছে এবং মুসলিমগণ সর্বযুগে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে তা বাস্তবায়ন করেছেন। এরপরও ১৯৯০ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কায়রো ঘোষণা ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপারে একটি অনবদ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'নাগরিক অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলাম' শিরোনামের প্রবন্ধটিতে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সনদ ও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা আশা করি জার্নালটির বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো দ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হবেন। সব ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

কিশোর অপরাধের কারণ ও প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ড. মো. মাসূদ আলম*

[**সার-সংক্ষেপ :** *কিশোর অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। সকল সমাজেই রয়েছে এর অনিবার্য উপস্থিতি। তবে প্রকৃতি ও মাত্রাগত দিক থেকে তা বিচিত্র। প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। ফলে শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিণত হতে পারে। যা একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে কিশোর অপরাধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। সুস্থ দেশ-জাতি ও শান্তিময় বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে কিশোর অপরাধের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ইসলামের আলোকে এর প্রতিকারের উপায় তুলে ধরা হয়েছে।*]

ভূমিকা

শিশু-কিশোররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির উন্নতি। শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের একটি অংশ কোন কারণে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চরম হুমকি ও সুস্থ সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য নয়। এজন্যই ইসলাম শিশু-কিশোরদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং অপরাধমুক্ত জীবন যাপনে উপস্থাপন করেছে সর্বজনীন ও কল্যাণকর নীতিমালা। যা বাস্তবে কার্যকর করতে পারলে পরিবার পেতে পারে কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি এবং দেশ ও জাতি লাভ করতে পারে অমূল্য সম্পদ।

কিশোর অপরাধ পরিচিতি

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির ইংরেজী হলো Juvenile Delinquency। আর Delinquency ল্যাটিন শব্দ Delinquer থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ to omit বাদ দেয়া, বর্জন করা, উপেক্ষা করা ইত্যাদি।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

রোমানরা কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্ম অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা বুঝাতে Delinquency শব্দটি ব্যবহার করত।[১] ১৪৮৪ সালে উইলিয়াম কক্সসন সর্বপ্রথম Delinquent পরিভাষাটিকে দোষী ব্যক্তির প্রচলিত অপরাধ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৬০৫ সালে ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক "Macbeth" এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[২]

কিশোর অপরাধ পরিভাষা আলোচনার পূর্বে শব্দ দু'টিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিপাদ্য বিষয় সহজেই অনুমেয় হবে। সাধারণত কিশোর বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তথা বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সের ছেলে-মেয়েদের বুঝায়।[৩] তবে কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত আইনে দেশ ও সমাজভেদে নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে মেয়েরা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত। যেমন বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বয়স সীমা হলো ৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত।[৪] এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:[৫]

দেশের নাম	বয়স সীমা		
মায়ানমার	৭ থেকে ১৬	বছর	পর্যন্ত
শ্রীলংকা	৭ থেকে ১৬	"	"
ভারত	৭ থেকে ১৬	"	"
পাকিস্তান	৭ থেকে ১৫	"	"
ফিলিপাইন	৯ থেকে ১৬	"	"
থাইল্যান্ড	৭ থেকে ১৮	"	"
জাপান	১৪ থেকে ২০	"	"
ইংল্যান্ড	৮ থেকে ১৭	"	"
ফ্রান্স	১৩ থেকে ১৬	"	"

---

১. The term "Delinquency" has been derived from the Latin word Delinquer which means "to omit", The Romans used the term to refer to the failure of a person to perform the assigned task or duty. দ্র: Dr. N. V. Pranjape, *Criminology and Penology*, Allahbad : Central Law Publications, 2005, p. 486.

২. *Ibid.*

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি., ২৪তম সংস্করণ, পৃ. ১৫২

৪. পান্না রানী রায়, *অপরাধবিজ্ঞান*, ঢাকা : উপমা প্রকাশন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৭৪

৫. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৬৪

পোল্যান্ড	১৩ থেকে ১৬	"	"
অস্ট্রিয়া	১৪ থেকে ১৮	"	"
জার্মানী	১৪ থেকে ১৮	"	"

মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসীম রহমতে মানব সন্তান শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়কাল পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ.وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর তোমরা যেন যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, সে যেন জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে স্বজ্ঞান থাকে না।[৬]

মানব জীবনের বিবর্তিত স্তরগুলোকে আরবী অভিধানে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৭] ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর বলতে ঐ ছেলেদের বুঝিয়েছেন যাদের ইহ্‌তিলাম[৮] বা স্বপ্নদোষ শুরু হয়নি এবং কিশোরী বলতে যাদের হায়েয[৯] বা মাসিক

---

৬. আল-কুরআন, ২২ : ৫

৭. মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সন্তানকে জানীন (جنين), ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে সাতদিন বয়সের সন্তানকে সাদীগ (صديغ), দুগ্ধপানকারীকে রাযী (رضيع), দুধ ছাড়ানো সন্তানকে ফাতীম (فطيم), নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারা সন্তানকে দারিজ (دارج), দুধের দাঁত পড়া সন্তানকে মাছগুর (مثغور), দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠা সন্তানকে মুছ্‌ছাগির (مثغر), দশ বছর অতিক্রমকারীকে মুতার'আরি' (مترعرع), ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী মুরাহিক/ইয়াফি (مراهق/يافع), স্বপ্নদোষ হলে তাকে হাযাওয়ার (حزور), উপর্যুক্ত সকল অবস্থাকে বলা হয় গোলাম (الغلام), গোঁফ কালো হলে তাকে বাকল (بقل), ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্য বয়সের লোককে শাববুন (شاب), ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে কাহলুন (كهل) এবং ষাট বছরের বয়সের পর সময়কে হারিম (هرم) বলে। দ্রঃ আবূ মানছূর আছ-ছা'লাবী, *ফিকহুল লুগাহ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ১৭

৮. ইহ্‌তিলাম (احتلام): ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুতবেগে পুরুষ বা নারীর বীর্য নিসৃত হওয়াকে ইহ্‌তিলাম বলা হয়। দ্রঃ সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামী, ১৩৯৭ হি. পৃ. ১০১

ঋতুস্রাব হয়নি এমন মেয়েদেরকেই বুঝিয়েছেন।[১০] ইসলাম কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়সের উল্লেখ না করে বিশ্বজনীন ও বাস্তবসম্মত নীতি হিসেবে বয়ঃপ্রাপ্তিকে চূড়ান্ত সীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ হিসেবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তারা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলো হলো ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় ইহতিলাম বা বীর্যপাত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

তোমাদের সন্তানেরা স্বপ্নদোষ[১১] হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছলে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।[১২]

এছাড়াও মেয়েদের হায়েয বা মাসিক ঋতুস্রাব ও গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তি প্রমাণিত হতে পারে।[১৩]

উপর্যুক্ত লক্ষণগুলোর কোনটিই যদি কারো মধ্যে প্রকাশিত না হয়, সে ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের মাধ্যমে বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করা যায়। তবে ইসলামী আইনবিদগণ কিশোর-কিশোরীর বয়সের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও মালিকী আইনবিদদের মতানুযায়ী, যে ছেলের ইহতিলাম বা বীর্যপাত হয়নি, তার আঠার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যে মেয়ের ইহতিলাম বা বীর্যপাত

---

৯. হায়েয (حيض) শব্দের অর্থ প্রবাহ বা স্রাব। প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জরায়ু থেকে রোগব্যাধি ব্যতীত প্রতি মাসে কয়েকদিন যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই হায়েয বলে। দ্র. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিক্হী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

১০. 'আলা-উদ্দীন আবূ বকর ইবন মাস'উদ আল-কাসানী, *বাদা'ইউস সানাঈ'*, করাচী : আদব মানযিল, ১৪০০ হি., খ. ৭, পৃ. ১৭২; মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, মিসর : কিতাবুশ শা'আব, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৯১; আল-হাত্তাব মুহাম্মদ আত্-তারাবিলসী, *মাওয়াহিবুল জালীল*, লিবিয়া : মাকতাবাতুন নাজাহ, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৫৭-৫৯; আহ্মদ ইব্ন আলী ইবন হাজার আল-'আস্কালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০হি., খ. ৫, পৃ. ৩৪৭

১১. আয়াতে اَلْحُلُمَ শব্দটি 'ইহতিলাম' শব্দ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষ্য। এর অর্থ স্বপ্নদোষ। (ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সংস্করণ, খ.১২, পৃ.১৪৫)

১২. আল-কুরআন, ২৪ : ৫৯

১৩. আল-হুসায়ন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি., খ. ২, পৃ. ১২

হয়নি, তার সতের বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিশোরী বলে গণ্য করা হবে।[১৪] অন্য দিকে কোন ছেলে-মেয়ের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, তাহলে পনের বছর বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা উভয়ই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ, হানাফী আইনবিদ ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ রহ. সহ অধিকাংশ আইনবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

অপরাধের আরবী আল-জারীমাহ (الجريمة)। ইংরেজীতে একে crime, offense বলা হয়।[১৬] আল-জারীমাহ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-জারাইম (الجرائم) , যা আল-জুরম (الجرم) থেকে উদ্ভূত। আল-জুরমু (الجرم) শব্দটির জীম অক্ষরে পেশ যোগে অর্থ পাপ (الذنب), সীমালঙ্ঘন (التعدى) ইত্যাদি।[১৭] ইসলামী আইনের পরিভাষায় অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[১৮]

কিশোর অপরাধ প্রত্যয়টির সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোর বয়সে অবাঞ্ছিত ও সমাজ বিরোধী আচরণ সম্পাদন করাকেই বলা হয় কিশোর অপরাধ।[১৯] মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan বলেন, সমাজ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ।[২০]

---

১৪. আল-কাসানী, *বাদাই'উস সানাঈ'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২, ইব্‌ন হাজার 'আল-'আস্‌কালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৭; সায়্যিদ সাবিক, *ফিক্‌হুস সুন্নাহ*, আল-কাহেরা : দারুল ফাত্‌হ, ১৪২০হি., খ. ৩, পৃ. ২৮২; মুহাম্মদ আবূ-যাহরাহ, *আল-জারীমাহ*, আল-কাহেরা : দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩৭

১৫. আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ'*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৭২; ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৮; জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী, *আল-আশ্‌বাহ ওয়ান নাযাইর*, আল-কাহেরা : তাব'আ আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৭ হি., পৃ. ২৪০; ড. ওয়াহ্‌বাবাতুয যুহায়লী, *আত্‌-তাফসীরুল মুনীর*, দামিশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮হি., খ. ৪, পৃ. ২৫০; মুহাম্মদ আবূ যাহরাহ, *আল-জারীমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

১৬. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London : Macdonald and Evens Ltd, 1980, p.121

১৭. ইব্‌ন ফারিস, *মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ২১০; ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৪২০হি., খ. ২, পৃ. ১০৫

১৮. الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير আবুল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ২৭৩

১৯. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, ঢাকা : প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৪৪

২০. Dr. N. V. Pranjape, *Criminology and Penology*, ibid, pp. 486-87

আইনগত দিক থেকে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক আইন বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় কর্ম সম্পাদন করাকেই বুঝায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে কিশোর অপরাধের নির্ধারিত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সংজ্ঞায় বলা হয়,

> Juvinile Delinquency should be understood the commission of an act which is commited by an adult, would be considered a crime.[২১]
>
> কিশোর অপরাধ বলতে কমিশন সে কাজকে বুঝায়, যে কাজ একজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে কিশোর অপরাধের পরিচয়ে বলা যায় যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক সংঘটিত দেশীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকেই কিশোর অপরাধ বলে।

কৈশোরকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ স্তর শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানব সন্তানের উপর বিভিন্ন শর'ঈ বিধি-বিধান ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এর আগ পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা গায়রু মুকাল্লাফ বা বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতামুক্ত হিসেবে বিবেচিত। কেননা হাদীসে তিন ব্যক্তিকে শরী'আতের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বলা হয়েছে,

> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
>
> তিন ব্যক্তি যাবতীয় দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতক্ষণ না বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।[২২]

সেজন্য আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনজনিত অথবা মানুষের অধিকার ক্ষুণ্নকরণজনিত কারণে তাদের উপর শরী'আত নির্ধারিত হুদূদ[২৩] ও কিসাস[২৪] পর্যায়ের শাস্তি প্রযোজ্য

---

২১. C.N. Shankar Rao, *Sociology : Primary principles of Sociology*, S. Chand Limited, 2006, p. 543

২২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আল-মাজনূনু ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯ হি., খ. ৩, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৪৪০৩; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ৯, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং-৪৪০৩

২৩. হুদূদ (حدود): আরবী ভাষায় 'হুদূদ' শব্দটি 'হদ্দ' এর বহুবচন। ইসলামী আইনের পরিভাষায় হদ্দ হলো আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি, যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। দ্র. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, ১৯৯২ খ্রি., খ. ৯, পৃ. ৩৬

২৪. কিসাস (قصاص): শব্দটি قص শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সমতা বা সাদৃশ্য বিধান, কর্তন করা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারী বা

নয়। তবে জনস্বার্থে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদেরকে সংশোধনমূলক তা'যীরী[২৫] শাস্তি প্রদান করার নির্দেশনা ইসলামী আইনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ...

> مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
>
> তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সের পর সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দিবে।[২৬]

এ প্রসঙ্গে ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির এর অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোর ব্যভিচার অথবা চুরি অথবা ডাকাতির মতো অপরাধ করলে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী বলে গণ্যই করা হবে না- এমনটি মনে করা সঠিক নয়, কেননা তা হবে আইনের অপব্যাখ্যা মাত্র। বরং উত্তম হলো যে, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অপরাধের ন্যায় শিশু-কিশোরের অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো- শর্তপূরণ না হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন হুদূদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। তবে কোন শিশু-কিশোর যদি শরী'আতের সুনির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য গুরুতর অপরাধ করে অথবা সুনির্দিষ্ট তা'যীরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন একটি অপরাধ সংঘটন করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক কোন শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[২৭] অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে কর্তৃক শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে তা'যীর প্রযোজ্য হয়।

আহতকারীকে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বলে। দ্র. ড. রাওয়াস কা'লাজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী : ইদারাতুল কুরআন, ১৪০৪ হি., পৃ. ৩৬৪; ড. সায়্যিদ হাসান 'আব্দুল্লাহ, *আল-মাকাসিদুশ শার'ঈয়্যাহ লিল 'উকূবাহ ফীল ইসলাম*, বৈরূত : দারু ইবন হাযম, ১৪২৭ হি., পৃ. ১৩৯

২৫. তা'যীর (تعزير): শব্দটি আল-'উযরু (العزر) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, নিষেধ করা, সাহায্য করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় যে সব অপরাধের জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয় নি, সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে। দ্র. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০; আস-সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৫

২৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সালাত, অনুচ্ছেদ : মাতা ইয়ুমারুল গুলামু বিস-সালাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫, হাদীস নং- ৪৯৫; হাদীসটি হাসান ও সহীহ (حسن و صحيح), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ৪৯৫, হাদীস নং-৪৯৫

২৭. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, *আত্-তা'যীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল কাহেরা : দারুল ফিক্র আল-'আরাবী, ১৪২৮ হি., পৃ. ৫৮

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয়। তথাপিও অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। যা অপরাধের নানাবিধ সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক। কিশোর অপরাধের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বর্তমানের ধর্মহীনতাই অন্যান্য অপরাধের ন্যায় কিশোর অপরাধের কারণ।[২৮] অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের জনক কার্লমার্কস্ এর মতে, কিশোর অপরাধসহ সব ধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাব।[২৯] আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানের জনক সিজার লোমব্রোসো কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে জৈবিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[৩০] সমাজবিজ্ঞানী হিলি এবং ব্রোনার (Healy and Bronner) কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[৩১] বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তে মানুষের মনোজগতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩২]

জৈবিক কারণ

বংশগতি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক বৈশিষ্ট্য কিশোর অপরাধের অন্যতম একটি কারণ। শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেটিই তার বংশগতি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয় বংশগতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জন্মগতভাবে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে তারা অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে।[৩৩] জন্মগত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলো যেমন মাথার খুলি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট বা বড়, গাঢ় ও ঘন ভ্রু, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত হাতের তালু, প্রশস্ত কান, ঘন চুল, লম্বা বাহু, চোখ বসা, হাত-পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, সংকীর্ণ

---

২৮. অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *অপরাধ বিজ্ঞান*, ঢাকা : মুহিত পাবলিকেশন, ২০১০ খ্রি., পৃ. ২৩৬

২৯. *প্রাগুক্ত*

৩০. 'উবূদুস সিরাজ, *'ইলমুল ইজরাম ওয়া 'ইলমুল 'ইকাব*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় : ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি., পৃ. ১৮৩

৩১. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, ঢাকা : অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১২ খ্রি., পৃ. ২৭৪

৩২. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৩ খ্রি., পৃ.২০৭-০৯; বোরহান উদ্দীন খান, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : প্রভাতী প্রকাশনী ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১১৩

৩৩. 'উবূদুস সিরাজ, *'ইলমুল ইজরাম ওয়া 'ইলমুল ইকাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে কিশোর অপরাধের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। দরিদ্রতা ও সম্পদের প্রাচুর্য উভয়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিশোর অপরাধ সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দরিদ্রতার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে কিশোররা বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ স. কুফরীর পাশাপাশি দরিদ্রতা থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

اللهم اني اعوذبك من الفقر و الكفر

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪৫]

অন্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে, كاد الفقر أن يكون كفراً দরিদ্রতা কুফরী ডেকে আনে।[৪৬]

তেমনিভাবে সম্পদের প্রাচুর্যের অপব্যবহার শিশু-কিশোরদেরকে অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ এ বাস্তবতাকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾

আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা জমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো।[৪৭]

সামাজিক কারণ

কিশোর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। বিধায় আবাসিক পরিবেশ, সঙ্গীদের প্রভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি সামাজিক উপাদানগুলো শিশু-কিশোরদের আচরণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ক. আবাসিক পরিবেশ : শিশু-কিশোরদের নৈতিক ও সামাজিক আচরণের উপর আবাসিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যই বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ (যেমন ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা) কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ধাবিত করতে পারে। বিভিন্ন আবাসিক এলাকার উপর পরিচালিত গবেষণামূলক জরিপে প্রতীয়মান হয় যে, বস্তি এলাকার বিরাজমান সামাজিক

---

৪৫. আস-সুয়ূতী, *শারহু সুনানিন নাসাঈ*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী তা.বি., খ. ৮, পৃ. ২২৬; শায়খাইন এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) , আল-হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, অধ্যায় : আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : আদ্ দু'আ ওয়াত তাকবীর ওয়াত তাহলীল ওয়াত তাসবীহ ওয়ায যিকর, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ : ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ৪৯২, হাদীস নং-১৮৯৯

৪৬. আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : আল-হাছ্ছু 'আলা তারকিল গিল্লি ওয়াল হাসাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১৪, পৃ, ১২৫, হাদীস নং-৬৩৩৬; হাদীসটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহ্দাছিল যা'ঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাছ্ছায়্যি ফীল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, ১৪১২ হি., হাদীস নং-৪০৮০

৪৭. আল-কুরআন, ৪২ : ২৭

পরিবেশই অপরাধমূলক আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেননা বস্তি এলাকার লোকজন সাধারণত অস্থায়ী বাসিন্দা হয় এবং তারা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সংযোগ ও সংহতি থাকে না। এরূপ পরিবেশে শিশুরা গৃহের বাইরে অবাধে অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়।[৪৮]

খ. সঙ্গদল : কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সঙ্গদলের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমবয়সীদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা অত্যন্ত সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, যা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে তা করতে পারে না।[৪৯] সুতরাং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ অসৎ প্রকৃতির বা অপরাধপ্রবণ থাকলে তাদের প্রভাবে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।[৫০] রাসূলুল্লাহ স. ভাল ও খারাপ প্রকৃতির সঙ্গীর সাথে উঠা-বসার বাস্তব পরিণতি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরে বলেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ

ভাল মানুষের সাহচর্য লাভকারী ব্যক্তি মিস্‌ক সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রেতার ন্যায়। সে যদি তোমাকে মিস্‌ক নাও দেয়, তবে এর একটু ঘ্রাণ তোমার নিকট পৌঁছবেই। আর মন্দ লোকের সাহচর্য অবলম্বনকারী কর্মকারের ন্যায়। কর্মকারের হাপরের ময়লা তোমার গায়ে না লাগলেও একটু ধুয়া হলেও তোমার গায়ে লাগবে।[৫১]

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা : সামাজিক পরিবেশে পরিবারের ভূমিকার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব শিশু-কিশোরদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এসকল প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেমন শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, সততা, আন্তরিকতা, ছাত্র শিক্ষকের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চেতনা কার্যত অনুপস্থিত।[৫২] এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য গঠনমূলক চিত্তবিনোদন, খেলা-ধুলার সুযোগ

---

৪৮. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ২১২

৪৯. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, পৃ. ৬৫২

৫০. আদনান আদ-দূরী, *আস্‌বাবুল জারীমা ওয়া তবী'আতুস সুলূকিল ইজরামী*, কুয়েত : মানশুরাতু যাতিস সালাসিল, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৩০৬; আনোয়ার মুহাম্মদ, *ইনহিরাফুল আহদাছ*, আল-কাহেরা : দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ১১৫-১১৬

৫১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদব, অনুচ্ছেদ : মান ইয়ুমারু আন ইয়ুজালিসা, খ. ৩, পৃ. ১৮৬-১৮৭, হা-৪৮২৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩২৯; হাদীস নং-৪৮২৯

৫২. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

সুবিধা ও শিক্ষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও প্রকট। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি শিশু-কিশোরদের রুচি ও সামর্থ্যের অনুপযোগী হলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা নানা অপরাধমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। যেমন স্কুল পালিয়ে তারা রাস্তায় ঘোরাফিরা করে এবং ইভটিজিং, আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও বিপণনসহ নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ. সামাজিক শোষণ বঞ্চনা : বর্তমানে জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পেশা গ্রহণে ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারার কারণে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। ফলে তাদের মনে তীব্র হতাশা ও নৈরাশ্য দানা বাঁধে, যা এক পর্যায়ে সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আক্রোশে রূপ নেয়। এমন পরিস্থিতে এই ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং অপরাধমূলক আচার আচরণে লিপ্ত হয়।[৫৩]

ঙ. ভৌগোলিক পরিবেশ : কিশোর অপরাধের সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মরু এবং গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার মানুষ সাধারণত রুক্ষ স্বভাবের ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে থাকে। এছাড়াও অরণ্যে ঘেরা দূর্গম পাহাড়ী এলাকা, চরাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলক অপরাধপ্রবণ হয়।[৫৪] অপরাধবিজ্ঞানী ডেক্সটারের মতানুযায়ী, বায়ুর চাপের সাথে মানুষের স্নায়ুবিক চাপ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তার ফলে ব্যারোমিটারে পারদের উঠা-নামার সাথে অপরাধ প্রবণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।[৫৫] অন্যদিকে জলবায়ুর প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক শিশু-কিশোর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে উদ্বাস্তু ও ভাসমান হিসেবে বেড়ে উঠে। বিধায় জীবনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এসব কিশোরের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৫৬]

চ. ঘন ঘন কর্মসংস্থান পরিবর্তন : পিতা-মাতার ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে শিশু-কিশোররা নতুন নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সহজেই তা অনুসরণ করতে পারে না এবং তাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠে। ফলে এটি শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।[৫৭]

---

৫৩. প্রফেসর মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩; ইবরাহীম 'আব্দুহ আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৫৪. ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৫৫. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

৫৭. ইবরাহীম 'আব্দুহ আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

ছ. গণমাধ্যমের প্রভাব : বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, ইউটিউবের ন্যায় গণমাধ্যমগুলো শিশু-কিশোরদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই উক্ত গণমাধ্যমগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা যথেষ্ট সচেতন না হলে কোমলমতি শিশু-কিশোররা অপরাধে লিপ্ত হতে পারে। বিশেষ করে কুরুচিপূর্ণ যৌন আবেগে ভরপুর ম্যাগাজিন ও পত্রিকা কিশোর-কিশোরীদের মন-মানসিকতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যৌন রসে সিক্ত সিনেমা, বিজ্ঞাপন চিত্র, ফ্যাশন শো-এর নামে টেলিভিশনে প্রদর্শিত যৌন আবেদনময়ী অনুষ্ঠানমালা আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও মানসিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিপথগামী করে তোলে।[৫৮] এছাড়াও টেলিভিশনে প্রদর্শিত দুঃসাহসিক অভিযাত্রার সিরিয়াল, ভায়োলেন্স এবং অপরাধের নানা কলা-কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিশোর-কিশোরীরা অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে।[৫৯] অধুনা সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীরা আশঙ্কাজনক হারে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।[৬০]

জ. মাদকাসক্তি : মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তিও অনেক ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধের উৎপত্তি ঘটায়। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হতে পারে।[৬১] এছাড়াও মাদকদ্রব্য পাচার ও বিপণনের কাজে কিশোর-কিশোরীরা জড়িত থাকার কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটতে পারে এবং দেখা দিতে পারে নানা ধরনের অপরাধ। এজন্যই মাদকদ্রব্যকে বলা হয়েছে, أم الخبائث অর্থাৎ সকল প্রকার খারাপ কাজের সূতিকাগার।[৬২] কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে সে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী-শিশু নির্যাতন, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, আত্মহত্যা, পকেটমারা ইত্যাদি বড় বড় সামাজিক

---

৫৮. আলী মুহাম্মদ জা'ফর, *আল-আহদাছ আল-মুনহারিফুন*, বৈরূত : আল-মু'য়াসসাতুল, জামি'ইয়্যাহ, ১৪০৫ হি., পৃ. ৮৭; আদনান আদ-দূরী, *আসবাবুল জারীমা ওয়া তবয়িাতুস সুলূকিল ইজরামী*, পৃ. ৩৩৮; আহমাদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রিয়া'আতুল ইজতামা'ইয়াহ লিল আহদাছিল জানিহাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৫৯. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০; ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮-২৭৯; ইবরাহীম 'আব্দুহু আশ-শুরকাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৬০. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৬১. প্রফেসর মজুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

৬২. ইমাম আদ-দারাকুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিবা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., খ. ৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং-৪৫৬৬

অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিমুখ করে রাখে এবং পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয় । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?[৬৩]

মদপানের ভয়াবহতা ও অনিষ্টতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'উছমান রা. বলেন, 'পূর্ববর্তীকালে একজন ভালো লোক সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত। একজন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা করলো। তখন সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি মহিলার ঘরে প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। একজন সুন্দরী মহিলা, একটি সুদর্শন বালক ও এক পেয়ালা মদ দেখিয়ে মহিলাটি বললো, আমি প্রস্তাব করব, তার কোন একটি গ্রহণ না করলে তোমার মুক্তি নেই। হয় এই সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করতে হবে, নয়তো এ সুদর্শন বালককে হত্যা করতে হবে, আর না হয় মদ পান করতে হবে। লোকটি ভেবে দেখল, তিনটি অপরাধের মধ্যে মদ পান অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। অতএব, লোকটি মদ পান করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর সে বললো, আমাকে মদ দাও। তখন তাকে মদ পান করতে দেয়া হলো। সে অধিক মদ পান করে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো এবং এক পর্যায়ে বালকটিকেও হত্যা করলো।'[৬৪]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মদ পানকারী শুধু নির্দিষ্ট একটি অপরাধের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তার দ্বারা অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে।

---

৬৩. আল-কুরআন, ৫ : ৯১

৬৪. إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ
দ্রঃ ইমাম আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদ : যিকরুল আছামি আল-মুতাওয়াল্লিদাতি আন-শুরবিল খামরি মিন তারকিস সালাওয়াত, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি., পৃ. ২৮২, হাদীস নং-৫৫৭২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া যঈফু সুনানি নাসাঈ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ১২, পৃ. ১৬৬; হাদীস নং-৫৬৬৬

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানসিক গুণাবলির সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে। এজন্যই প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড[৬৫] অবদমিত কামনাকে অপরাধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৬] এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্যটিও প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন "বেশির ভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন বঞ্চনা এবং নিপীড়নের কারণে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে মনের কোমল অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে তার বদলে জন্ম নেয় হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব।"[৬৭] এছাড়া ব্যক্তিগত আবেগীয় সমস্যাও কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের কিশোররা খুব সহজেই অনিয়ন্ত্রিত আবেগে আক্রান্ত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও চাহিদা পুরণের মাধ্যমে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয় এবং অপরাধ সংঘটন করে।[৬৮] এজন্যই মার্কিন মনোবিজ্ঞানী হিলে ও ব্রুনার কিশোর অপরাধের জন্য বাধাগ্রস্ত আবেগকে দায়ী করেছেন।[৬৯]

কিশোর অপরাধ সংঘটনে উপর্যুক্ত কারণগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে কিশোর অপরাধের প্রধান ও মূল কারণ হলো মানসিক। কেননা মানুষের প্রতিটি কর্মই মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে।[৭০] আর মানসিক বিকাশ সঠিক ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হলে শিশু-কিশোরদের আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং তাকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। মানব মন মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

---

৬৫. সিগমুন্ড ফ্রয়েড, Sigmund Frud, ১৮৫৬ সালের ৬ই মে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জেকব ফ্রয়েড এবং মাতার নাম এ্যামিলিয়া নাথানস। তিনি ১৮৭৩ সালে ১৭ বছরে বয়সে ডাক্তারী পড়তে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৮১ সালে ২৫ বছর বয়সে ডাক্তারী পাশ করে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি মারা যান। দ্রঃ Encyclopedia Americana, U.S.A : Americana Corporation, 1924, vol. 12, p. 83-87; Calrin S. Hall, *Frcudian Psychology*, New York : The World Publishing Company, 1954, pp. 3-11; ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২০৯

৬৬. Robert C. Trojanowicz, *Juvenile Delinquency Concepts and Controls*, New Jersey : Prentice Hall, Inc. 1978, p. 55.

৬৭. প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

৬৯. ড. এ.এইচ.এম মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৭০. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : বাদউল ওয়াহী, অনুচ্ছেদ : কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহ, খ. ১, পৃ. ৯, হাদীস নং-১

এর সুষ্ঠু লালন ও বিকাশ সাধন করলে তা ভাল কাজ সম্পাদন করে। আর লালন পালন ও বিকাশ সাধনে ত্রুটি হলে তা দ্বারা মন্দ কর্ম বা অপরাধ সংঘটিত হয়। মনের এ বিপরীতমুখী দ্বিবিধ আচরণের বাস্তব তত্ত্ব তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

প্রাণের শপথ, আর শপথ সে সত্তার, যিনি তাকে সুসংহত করেছেন। অতঃপর তাকে দিয়েছেন ভাল-মন্দের অনুভূতি। যে তাকে পরিচ্ছন্ন রেখেছে, সে নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে মলিন করেছে।[৭১]

নু'মান ইবন বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান শুনে রেখো, দেহ বা শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ ও ভাল থাকে তখন সমস্ত দেহ ও শরীর ভাল থাকে এবং তা যখন নষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ ও শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রেখো, সেটি হলো ক্বালব বা অন্তর।'[৭২]

কিশোর অপরাধের প্রতিকার

কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সঠিক পন্থায় শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণেই মূলত কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়। এ ছাড়াও যে সব কারণে এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইসলাম সর্বজনস্বীকৃত প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিকার করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ইসলাম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আর সংশোধনমূলক ব্যবস্থায় নিয়েছে বাস্তবসম্মত নানা পদক্ষেপ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বুঝায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যেসব কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়, সেগুলোকে আগে থেকে দূর করাই এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] মানবজীবন কতগুলো স্তর বা ধাপের সমষ্টি। জীবন পরিক্রমায় এই স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। শিশু-কিশোরদের জীবন-প্রকৃতি বড়দের

---

৭১. আল-কুরআন, ৯১ : ৭-১০

৭২. দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : ফাদ্বল মান্ ইসতিবরাহা লি দীনিহি ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩, হাদীস নং-৫২; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহু ওয়া য'ঈফু সুনানি ইবন মাজাহ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৮, পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং-৩৯৮৪

৭৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

থেকে আলাদা। তাদের চাহিদা এবং বিকাশকালীন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও ভিন্নতর। বিধায় পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা যেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য যেসব কার্যকারণ অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে তাদেরকে উৎসাহিত করে অথবা তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাদেরকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর কতিপয় আবশ্যকীয় দায়িত্বারোপ করেছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. পরিবারের দায়িত্ব

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উত্তম স্থান হলো পরিবার। জন্মের পর শিশু পারিবারিক পরিবেশে মাতা-পিতার সংস্পর্শে আসে। শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি পরিবারেই রচিত হয়। তাই তাদের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এজন্যই ইসলাম শৈশবকাল থেকে ঈমানের শিক্ষা, 'ইবাদতের অনুশীলন, ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন ও নৈতিকতা উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে পরিবারের উপরে। যাতে করে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোররা অপরাধমুক্ত থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এবং তাদের পরিজনদের অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।[৭৪]

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম কুরতুবী রহ. লিখেছেন যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, সমস্ত কল্যাণকর জ্ঞান ও অপরিহার্য শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া আমাদের কর্তব্য।[৭৫]

অনুরূপভাবে মহানবীর স. হাদীসেও শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সামাজিকীকরণে পরিবারের দায়িত্বের বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

প্রত্যেকেই নিজ পরিবারের লোকদের তত্ত্বাবধায়ক এবং সে নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানাদির অভিভাবক। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৬]

---

৭৪. আল-কুরআন, ৬৬ : ৬

৭৫. فعلينا تعليم اولادنا واهلينا الدين والخير و ما لا يستغني عنه من الادب দ্র: মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহ্কামিল কুরআন*, আল-কাহেরা : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হি., খ. ১৮, পৃ. ৪২০

৭৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : আল-মারআতু রাইয়াতুন ফী বাইতি জাওযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬, হাদীস নং-৫২০০

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

পিতা তার নিজের সন্তানকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।[৭৭]

অতএব, বলা যায় যে, কিশোর-কিশোরীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে পরিবার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ যোগায়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কেননা তারাই শিশু-কিশোররের সামনে বহির্বিশ্বের বাতায়ন প্রথম উন্মুক্ত করে দেয় এবং সন্তানের অনুপম চরিত্র গঠনের কার্যকর অবদান রাখতে পারেন।

২. ঈমানের শিক্ষা

ঈমান[৭৮] মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানবজাতিকে ঈমানের দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। জাগতিক জীবনের প্রকৃত শান্তি, বিশুদ্ধ জীবনযাত্রা, সামগ্রিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি সবকিছুর সফলতা প্রকৃত অর্থে ঈমানের বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভরশীল। ঈমান হলো সকল প্রকার অপরাধ প্রতিরোধক। অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ঈমানের ভূমিকা অপরিসীম। যার হৃদয় মনে ঈমান সক্রিয় ও জাগরূক থাকে, সে কখনোই কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান লংঘন করে অপরাধে লিপ্ত হতে পারে না। তবে ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। যারা নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের প্ররোচনায় সকল প্রকারের পাপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। কেননা যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের নীতি গ্রহণ করবে, শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কর্মেরই আদেশ করবে।[৭৯]

কেবলমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। এজন্যই শিশু-সন্তান যখন প্রথম কথা বলতে শুরু করে, তখন ঈমানের প্রশিক্ষণ হিসেবে পিতা-মাতার উচিৎ, সন্তানের মুখ দ্বারা সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম উচ্চারণ করানো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে,

---

৭৭. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদুল মাক্কিয়ীন, বাব-১৩, *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ৩০, পৃ. ৪২০; হাদীস নং-১৪৮৫৬, হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক*, মক্কা আল-মুকাররামা : মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা আল-বায, ১৪২০ হি., খ. ৭, পৃ. ২৭৩৯, হাদীস নং-৭৬৭৯

৭৮. ঈমান শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাস করা। পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ স. তাঁর মহান রবের থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ ও বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে। দ্র. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-ফারহারী, *আন-নিবরাস*, দেওবন্দ : আল-মাকাতাবাতুল আশরাফিয়্যা, তা.বি., পৃ. ৪৬-৪৯

৭৯. আল-কুরআন, ২৪ : ২১

افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله

> তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শুরু করবে এই বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।[৮০]

একদা রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা।[৮১] উক্ত হাদীসে ঈমানকে শ্রেষ্ঠ কর্মরূপে চিহ্নিত করার মূলে ছিল, তার সর্বোত্তম কল্যাণের ধারক হওয়া এবং যাবতীয় অন্যায় অকল্যাণ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করা।[৮২]

এছাড়াও সন্তানদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা ঈমান আনয়নের আহ্বান জানাতে হবে। এ বিষয়ে লুকমান হাকীমের উপদেশগুলো প্রণিধানযোগ্য। যা প্রতিটি মানবসন্তানের ঈমানকে সুদৃঢ়, কর্মকে পরিশুদ্ধ, চরিত্রকে সংশোধন ও সামাজিক শিষ্টাচারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আল-কুরআনে উক্ত উপদেশাবলি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

> (হে নবী, স্মরণ করো) যখন লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললো, হে প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক গুরুতর অপরাধ।[৮৩]

এভাবে অভিভাবকগণ পর্যায়ক্রমে সন্তানদের সামনে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো যেমন আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের প্রতিটি পর্যায় যেমন কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের পরিচয় অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরে সেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন। ফলে সন্তানের ঈমান হবে সুদৃঢ়। আর ঈমান দৃঢ় ও শিরকমুক্ত হলে নৈতিক গুণাবলি অর্জন তার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে।

৩. ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলি

---

৮০. ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : হুকমূল আওলাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় সংস্করণ, খ. ১৮, পৃ. ১৬২, হাদীস নং-৮৩৯৭

৮১. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ দ্রঃ ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মান কালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল 'আমল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭

৮২. যয়নুদ্দীন ইবন রজব, *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম শারহু খামছীনা হাদীছান*, মিসর : মুস্তফা আল-হালাবী, ১৯৬২ খ্রি., পৃ. ২১

৮৩. আল-কুরআন, ৩১ : ১৩

উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। যে জ্ঞানের কল্যাণেই মানবজাতি সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন। সেটি হলো কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস। হাদীস তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।[৮৪]

বস্তুত জ্ঞানার্জন দীনকে ভালভাবে উপলব্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দীনের কল্যাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে জ্ঞানার্জনের উপর। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে কেবল বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে।[৮৫]

সুতরাং মাতা-পিতা সন্তানকে ঈমানের শিক্ষা প্রদানের পর ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করবেন এবং তাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। যাতে করে তারা অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা ভাল-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে অপরাধকর্ম থেকে।

৪. 'ইবাদত অনুশীলন

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে 'ইবাদতের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। 'ইবাদত বলা হয় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে আল্লাহর আনুগত্য করা। ব্যাপক অর্থে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার নামই 'ইবাদাত।[৮৬] ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত যথাক্রমে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছে এবং প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র এক আল্লাহর অনুগত বান্দাহ বানানো।[৮৭] যেমন সালাত মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহদের

---

৮৪. ইমাম ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মাহমূদ মুহাম্মাদ মাহমূদ হাসান নাস্‌সার, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল 'উলামা ওয়াল-হাছছু 'আলা তলবিল 'ইলম, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং-২২৪; ইমাম বায়হাকী হাদীসটির মতনকে মাশহুর (مشهور) এবং সনদকে য'ঈফ (ضعيف) বলে আখ্যায়িত করেছেন; ইমাম আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ : ফী তলবিল 'ইলম, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং-১৬১২

৮৫. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮

৮৬. ড. ইউসূফ হামিদ আল-'আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* রিয়াদ : আদ-দারুল 'আলামিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামী, ১৪১৫ হি., পৃ. ২৩৪

৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সৃষ্টি করে। যা তাদেরকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৮৮]

সিয়াম পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়। যা মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।[৮৯]

এভাবেই 'ইবাদত পালনের মাধ্যমে যাবতীয় অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম। মাতা-পিতা শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে তারা কুপ্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ কর্মে লিপ্ত না হয় এবং পরবর্তী জীবনে 'ইবাদত পালনে অভ্যস্ত হয়। শিশু-কিশোরদের উপর সালাত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ স. সন্তানদেরকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়ে বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[৯০]

৫. নৈতিকতার উন্নয়ন

চরিত্র মানুষের উত্তম ভূষণ। মানুষের আচার-আচারণ ও দৈনন্দিন কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তাকে আখলাক বা চরিত্র বলে।[৯১] বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ইমাম গাযালী রহ. চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'চরিত্র হলো মানব মনে প্রোথিত এমন অবস্থা, যা থেকে কোন কর্ম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই

---

৮৮. আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

৮৯. আল-কুরআন, ২ : ১৮৩

৯০. দ্রঃ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত

৯১. এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪ হি., পৃ. ৮১

অনায়াসে প্রকাশিত হয়।[১২] আর মানুষের আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা আদর্শের আলোকে গড়ে উঠলে তাকে বলা হয় নৈতিকতা। শৈশবকাল থেকেই মূলত নৈতিকতা বিকশিত হওয়া শুরু হয় এবং কৈশোরকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।[১৩] শিশু-কিশোরের নৈতিকতার উন্নয়নে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে পরিবারের ভূমিকাই মূখ্য। মা-বাবা নৈতিকতা মেনে চললে এবং শিক্ষা দিলে শিশু-কিশোররা তা অনুকরণ করে মেনে চলতে শিখবে। এভাবে তারা চরিত্র গঠনের নৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারলে কিশোর অপরাধ প্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চরিত্র গঠনের উত্তম গুণাবলি যেমন তাক্ওয়া, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানতদারিতা, সবর, ইহসান, বিনয়, নম্রতা, উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানকে শিক্ষা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ ক্ষেত্রে সন্তানকে উদ্দেশ্য করে লুকমান আ.-এর উপদেশগুলো সকল পিতা-মাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবে। যা আল-কুরআনে সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
★ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
★ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ﴾

হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারণ করবে, এটিই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে; নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[১৪]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. সন্তানদেরকে শৈশবকাল থেকে শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فإذا بلغ ست سنين أدب 'আর যখন সন্তান ছয় বছর বয়সে পদার্পণ করবে, তখন তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।'[১৫]

---

১২. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. দ্রঃ আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফা, তা.বি, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

১৩. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১৭-১৯

১৫. আবূ হামিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৭, হাদীছটি সাহীহ নয়। ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী রাহ. একে ইমাম গাযালীর 'ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন'-এ উল্লেখিত সে সব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেগুলোর তিনি কোনো সনদ খোঁজে পান নি। (তাজুদ্দীন আস-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফি'ইয়াতিল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৩১৮)

পিতা-মাতা সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিবেন যেমন খাবার, পানাহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচার সহ যাবতীয় আদব শিখাবেন। যা তাদের নৈতিকমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে 'উমার ইবন আবী সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি শৈশবকালে রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ স. আমাকে বললেন,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

হে বালক! আল্লাহর নাম বলো, ডান হতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।[১৬]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিশু-কিশোরদের সার্বিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সে পরিবেশটিকে যথাসম্ভব সবদিক থেকে স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হবে। অভাব-অনটন, পারিবারিক সমস্যা, পিতা-মাতার কলহ-দ্বন্দ্ব যেন সন্তানদেরকে স্পর্শ না করে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শিশু-কিশোরদেরকে অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখতে সুস্থ গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন উপকারী খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আনন্দ ভ্রমণ প্রভৃতি।[১৭] তাদের নিত্যসঙ্গী, খেলাধুলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সেদিকে পিতা-মাতাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা বন্ধু ভাল না হলে জীবন-জগৎ ও পরকাল সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলাম বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্বারোপ করেছে।

এজন্যই মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলুল্লাহ স.-কে ভাল লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

নিজেকে তুমি তাদেরই সংস্পর্শে রাখবে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরে নিয়ো না; যার চিত্তকে বা অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।[১৮]

---

১৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস্-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আত্'ইমা, অনুচ্ছেদ : আত-তাসমীয়াতু 'আলাত ত্ব'আমি ওয়াল আকলু বিল ইয়ামীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯, হাদীস নং-৫৩৭৬

১৭. আশ-শায়খ আস'আদ মুহাম্মদ, *গু'আবুল ঈমান*, বৈরূত : কালিম আত্‌ত্বয়্যিব, ১৪১৮ হি., খ. ৪, পৃ. ৯৮

১৮. আল-কুরআন, ১৮ : ২৮

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ

মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা বন্ধু গ্রহণ করবে, তারা যেন পর্যবেক্ষণ করে তা গ্রহণ করে।[৯৯]

সমাজের দায়িত্ব

শিশু-কিশোররা যে সমাজে বসবাস করে সে সমাজেরও রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজে যদি অন্যায়-অনাচার অবাধে চলতে থাকে, তাহলে শিশু-কিশোররা তা অনুসরণ করে অপরাধ প্রবণ হতে পারে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে কেবলমাত্র শিশু সমাজকে উন্নত করলেই চলবে না; বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন করতে হবে। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আচরণ, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান্নোনয়ন হলে স্বাভাবিকভাবেই তখন অপরাধ সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্যই ইসলাম সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى .وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত করবে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, দূরবর্তী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।[১০০]

ইসলাম সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অপকর্ম প্রতিরোধ করে সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিময় ও কল্যাণকর রাখার জন্য ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন,

---

৯৯. ইমাম আহমাদ, *আল মুসনাদ*, অধ্যায় : বাকী মুসনাদিল মুকাছ্ছিরীন, অনুচ্ছেদ : মুসনাদু আবী-হুরায়রাহ, *আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, খ. ১৬, পৃ. ২২৬, হাদীস নং-৭৬৮৫; ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান ও গরীব (حسن و غريب) বলেছেন এবং ইমান নববী রহ. সনদকে সহীহ (صحيح) বলেছেন; মুহাম্মাদ আত্-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকাতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ৮৭, হাদীস নং-৫০১৯

১০০. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল অবশ্যই হতে হবে, যারা মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে।[১০১]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

তোমরা কল্যাণকর ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। আর পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।[১০২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স. সমাজে অন্যায়, অপকর্ম হতে দেখলে তা প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় ও গর্হিত কাজ করতে দেখলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। এতে সক্ষম না হলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) প্রতিহত করে, তাতেও সক্ষম না হলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহিত করার চেষ্টা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[১০৩]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মু'মিনের দায়িত্ব হলো নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করবে ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যকেও ভাল কাজে উৎসাহ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন, সমাজ সেবামূলক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন ও ক্রীড়া বিষয়ক সংগঠন শিশু-কিশোরদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

মানব জীবনে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের পরিচয় লাভের জন্য শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যক। আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তাকে সঠিকভাবে

---

১০১. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪

১০২. আল-কুরআন, ৫ : ২

১০৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু কাওনিন নাহী 'আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযীদু, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি., খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং-৭৮

মানতে হলে শিক্ষা লাভের বিকল্প নেই। এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু-কিশোরদের মানবিক বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়। তাদের মেধা, মনন ও রুচি উৎকর্ষ লাভ করে এবং আচার-আচরণ হয় পরিশীলিত ও মার্জিত। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে শিশু-কিশোররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং এখানেই তাদের শিক্ষার মূল ভিত রচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষায়তনে শিশু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, পরবর্তী জীবনে তার চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে তাই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। শিশু-কিশোররা তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে যা শিখে তাই তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। পারিবারিক পরিবেশে যদি এর সমর্থন মিলে তাহলে তা তার চরিত্রে প্রোথিত হয়ে যায়। অতএব, অভিভাবক যদি মনে করেন যে, নৈতিকতা সম্পন্ন করে তিনি তার সন্তানকে গড়ে তুলবেন তাহলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহপাঠী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ; তাদের জীবন-দর্শন, তাদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা এগুলো শিক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন রহ. বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

> নিশ্চয়ই এই 'ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং কার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করছ তা সতর্কতার সাথে দেখে নিবে।[১০৪]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখান-সেখান থেকে এবং যার-তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ সমীচীন নয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকের মান কাঙ্ক্ষিত না হলে শিশু-কিশোররা বিপথগামী হতে পারে। ইসলাম জ্ঞানার্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিক্ষালাভকে সকলের মৌলিক ও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। আল-কুরআনে অনেকগুলো আয়াতে শিক্ষার বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾

---

১০৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, খ. ১, পৃ. ১৪; ইবনু সীরান রহ. এর উক্তি হিসেবে এটি সহীহ (صحيح) যেমনটি আল-আলবানী *মিশকাতুল মাসাবীহ*-এর তাহকীক-এ উল্লেখ করেছেন। *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-২৭৩; তবে এটি রাসূলুল্লাহ সা. এর হাদীস হিসেবে খুবই দুর্বল (ضعيف جدا); দ্র. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুয যঈফাহ*, হাদীস নং-২৪৮১

আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনান, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করেন, তোমাদেরকে আল-কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকমাহ (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। আর যা তোমরা জানোনা, সেগুলো শিক্ষা দেন।[১০৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

(তারা) এমন কেন করলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকেই কিছু কিছু লোক বের হতো, যাতে করে তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানাশীলন করতো, অতঃপর যখন তারা নিজ নিজ জাতির কাছে ফিরে আসতো, তখন তাদের জাতিকে তারা সতর্ক করতো, যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে।[১০৬]

এই আয়াতটিকে ইমাম কুরতুবী রহ. জ্ঞান শিক্ষার মৌলিক দলীল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০৭] আলোচ্য আয়াতে 'ইলম শিক্ষার প্রকৃতি, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব কী হবে তা বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের নির্দেশনা হাদীসেও এসেছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا

মানুষেরা তোমাদের অনুসরণ করবে এবং দীনের মর্ম জ্ঞান উপলব্ধি করার জন্য বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে তোমাদের কাছে ছুটে আসবে । তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমার তাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ (শিক্ষা) দিবে।[১০৮]

অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের উপযোগী কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী, উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারলে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখা যাবে এবং তারা নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে।

---

১০৫. আল-কুরআন, ২ : ১৫১

১০৬. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

১০৭. মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *আল-জামিউ' লি আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৬০৪

১০৮. ইমাম আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-'ইলম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফীল ইসতীসাই বিমান ত্বলাবাল 'ইলমা, পাগুক্ত, পৃ. ৬৬০, হাদীস নং-২৬৫০; হাদীসটির সনদ য'ঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া য'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৫০, হাদীস নং-২৬৫০

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্র বা সরকার সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা তাদের সামাজিক জীবনের আইন-শৃংখলা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সরকার বিভিন্ন রকম আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। বিধায় শিশু-কিশোরদের সামাজিক বিকাশ রাষ্ট্র দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু-কিশোর একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে অপরাধে লিপ্ত হোক এবং সমাজকে কলুষিত করুক এটি কারো কাম্য নয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সরকার শিশু-কিশোরদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন সব শিশু-কিশোরের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিত করা এবং পাঠ্যসূচীতে নৈতিকতার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশুপার্ক, শিশু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও খেলার মাঠ গড়ে তোলা এবং গণমাধ্যমে অশ্লীলদৃশ্য প্রদর্শন আইন করে বন্ধ করা। অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোরদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অন্যায় অপকর্ম প্রতিরোধ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্র কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে এবং সমাজকে রক্ষা করতে পারে যাবতীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে। যা সমাজে কার্যকর করতে পারলে কিশোর অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। সেজন্যেই ইসলাম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য কিছু মৌলিক কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।[১০৯]

---

১০৯. আল-কুরআন, ২২ : ৪১

উক্ত আয়াতে সালাত কায়েমের নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত শারীরিক 'ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, সরকার রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক 'ইবাদত পালনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করবে, যাতে করে শিশু-কিশোর সহ প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। তেমনি যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর সহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করবে। সকল প্রকার সৎ ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন এবং সমস্ত খারাপ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দান ও তা মূলোৎপাটন করা রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য।

সংশোধনমূলক ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণে বাস্তবসম্মত পদ্ধতি হলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। যে সকল কিশোর-কিশোরী অল্প বয়সের কারণে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই অপরাধের সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ করতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পন্থা অবলম্বন করেছে। এরপরও যদি মানবীয় দুর্বলতা ও শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে অপরাধের কারণ, অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিবেচনায় নিয়ে শিষ্টাচারমূলক তা'যীরী শাস্তি প্রয়োগ করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। যাতে করে তারা পরিবারের সাথে পুনরায় একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

কিশোর অপরাধের বিচারকাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় বয়স্কদের মতো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করে সহানুভূতিশীল ও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালতে বিচার পরিচালনা করাই শ্রেয়। শিশু-কিশোরদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশনা মহানবীর স. হাদীসেও পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا

> যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১১০]

কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান ও শুনানী সম্পন্ন করে সংশোধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে বিচারের রায় দেয়া। অপরাধে লিপ্ত শিশু-

---

১১০. ইমাম আত্-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির-ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী রহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬, হাদীস নং-১৯১৯; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); হাকিম আন-নায়শাপুরী, *আল-মুসতাদরাক*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬২৫, হাদীস নং-৭৩৫৩

কিশোরদের কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে মুক্ত রেখে সামাজিক পরিবেশে আত্মশুদ্ধির সুযোগ প্রদান এবং একজন উপার্জনক্ষম ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের আইনসম্মত সুযোগ প্রদানকে প্রবেশন বলা হয়।[১১১] এ ধরনের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে অপরাধী কিশোরদের নিয়মিত শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলা হয়।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম শিশু-কিশোরদের দায়মুক্তি নীতি গ্রহণ করেছে। তবে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের জন্য তা'যীরী বা শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে ।[১১২] যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং তাদেরকে দেখে সমাজের অন্য শিশু-কিশোররাও অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে।[১১৩] তা'যীরী শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

> مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
>
> তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।[১১৪]

হুদূদ ও কিসাস পর্যায়ের কোন অপরাধ কিশোর-কিশোরীরা সংঘটন করলে তাদেরকে ইসলামী শরী'আহ নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করা যাবে না। কেননা তারা শরী'আতের দায়-দায়িত্ব মুক্ত হওয়ায় শাস্তিযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে 'উমার রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

> لا قود ، ولا قصاص ، ولا قتل ، ولاحد ولا نكال ، على من لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه
>
> অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে তার জন্য এবং তার উপরে আরোপিত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর হদ্দ, কিসাস ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।[১১৫]

---

১১১. V.V. Devasia & Leelamma Devasia, *Criminalogy Victimology and Corrections*, New Delhi : Ashish Publishing House, 1992, p. 45.

১১২. আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩-৬৪

১১৩. ড. 'আব্দুল 'আযীয 'আমির, *আত্-তা'যীর ফিশ শারী'আলি ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১১৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কিশোর অপরাধ একটি জটিল ও মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধ প্রবণতার কারণগুলোকে পর্যালোচনা করলে যে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায় তা হলো, শিশু-কিশোররা বংশগতির মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে অপরাধ প্রবণতা লাভ করে না, যেমন কিছু রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিশোর অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকগুলো কারণ সম্পৃক্ত। যেমন পারিবারিক ভাঙন, গৃহের খারাপ পরিবেশ, অসৎ সঙ্গ, পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, গণমাধ্যমে কুপ্রভাব ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ বা মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা ইত্যাদি। তবে প্রবৃত্তির অনুসরণে মনের চাহিদানুযায়ী যা ইচ্ছা তা করাই কিশোর অপরাধের মূল কারণ। কেননা মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাল-মন্দ প্রতিটি কর্ম সম্পাদিত হয়। আর অন্যান্য কারণগুলো মনকে প্রভাবিত করে। মানুষের মনের সঠিকতার উপর নির্ভর করে আচরণের সঠিকতা। মন যখন ঈমান, যথার্থ 'ইলম, 'ইবাদত ও নৈতিক গুণাবলি দ্বারা সুশোভিত হবে, তখন ব্যক্তির সমস্ত কাজকর্ম সুন্দর হবে। সন্তানের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারে তার পরিবার। কেননা শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ তার পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সুশিক্ষা, সচ্চরিত্র এবং লালন-পালন সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকারে ইসলাম দু'ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তা হলো প্রতিরোধের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা এবং অপরাধ সংঘটনের পর শিষ্টাচারমূলক শাস্তি প্রয়োগে কিশোর-কিশোরীকে সংশোধন করা।

অতএব, সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিকার করতে হলে ইসলামের বিধি-বিধানকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে মেনে চলা ও কার্যকর করা একান্ত কর্তব্য। একমাত্র ইসলামী বিধি-বিধানই হতে পারে কিশোর অপরাধ প্রতিকারের সর্বোত্তম পন্থা। আর সেদিকেই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

এই হচ্ছে আমার অবলম্বিত সরল-সঠিক পথ। অতএব, তোমরা তারই অনুসরণ কর। এছাড়া অন্যান্য যেসব পথ রয়েছে, তা অনুসরণ করবে না। করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে ভিন্নতর পথে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন। আশা করা যায়, তোমরা বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে।[১১৬]

---

১১৫. আবু বকর 'আব্দুর রায্যাক, *আল-মুসান্নাফ*, বৈরূত : ১৩৯২ হি., ১ম সংস্করণ, খ. ৯, পৃ. ৪৭৪

১১৬. আল-কুরআন, ৬ : ১৫৩

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প : একটি পর্যালোচনা

ড. মাহফুজুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : *স্থাপত্য শিল্প মানব জীবনে অতি প্রয়োজনীয় একটি শিল্প। কোন মানুষই একটি বাড়ি ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন ও বসবাস করতে পারে না। বর্তমানে সারা বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গড়ে উঠছে পর্বত সমান নানান অট্টালিকা ও সুউচ্চ স্থাপনা। এমতাবস্থায় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে বিরাট অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কী? তা জানা আবশ্যক। কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে প্রচুর মতামত রয়েছে। স্থাপত্য শিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, অবস্থান, উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসলামের স্বতন্ত্র বক্তব্য। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করে আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে ইসলামের বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে স্থাপত্য শিল্পের সংজ্ঞা, ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে স্থাপত্য শিল্পের সম্পর্ক, স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়াবলি দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।]*

স্থাপত্য শিল্পের পরিচয়

স্থাপত্য একটি শিল্প, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক না থাকলেও এর সংজ্ঞা নিয়ে স্থাপত্যবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থাপত্য শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়। স্থাপত্যকে এ কারণেই সকল শিল্পকর্মের উৎস বা Mother of all arts বলা হয়েছে।[১] স্থাপত্যের সংজ্ঞায় কোন কোন ঐতিহাসিক যে কোন নির্মিত বস্তুকে স্থাপত্য বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ সুদৃঢ় ও সুশোভিত প্রাসাদকে স্থাপত্য বলে চিহ্নিত করেছেন।[২]

---

* অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মসজিদের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, পৃ. ১৭

২. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮, পৃ. ১০০

স্থাপত্য শিল্প বুঝাতে ইংরেজিতে Architecture পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। যার শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হলো, "ভবনের নকশা বা নির্মাণ-কৌশল বা নির্মাণ রীতি"।[৩] এ প্রক্ষিতেই ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী বলেছেন, সাধারণত Architecture বলতে আমরা মনুষ্য নির্মিত যে কোন প্রকারের স্বল্প পরিসরের কুঁড়েঘর বা প্রশস্ত অট্টালিকা বুঝি।[৪]

প্রফেসর ডব্লিউ. আর লেথাবি (W. R. Lethaby) স্থাপত্যের সংজ্ঞায় লিখেছেন,

> Architecture is the practical art of building touched with emotion, not only past, but now and in the future.[৫]

যদিও স্থাপত্য বলতে কেবল ইমারতকেই বোঝায় না, কারণ ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া ছাড়াও অসাধারণ ভাস্কর্য চিত্রকলা এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা বুঝায়।[৬] কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে স্থাপত্য শিল্প বলতে সাধারণভাবে বাড়ি-ঘর, অট্টালিকা-প্রাসাদ, সুউচ্চ ও মনোরম স্থাপনাকে বুঝানো হচ্ছে। ভূমি পরিকল্পনা ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নকশাসহ স্থাপত্য শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিকে বুঝানো হচ্ছে না।

ইসলামের জীবন দর্শন ও স্থাপত্য শিল্প

মানুষ যুগে যুগে যেসব শিল্পের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো স্থাপত্য শিল্প। কারণ মানুষের এ পৃথিবীতে আগমনের পর হতেই শীতকালে ঠাণ্ডা হতে, গ্রীষ্মকালে গরম হতে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হতে এবং রাতের অন্ধকারে পশু-প্রাণীর আক্রমণ হতে নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য এ শিল্পের প্রয়োজন হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন উপাসনা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বা অন্য কোন প্রয়োজনে এক স্থানে একত্রিত হবার জন্যও তাদের এই স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজন হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, মিসরী, ব্যাবিলিয়ন, গ্রিক, রোমান ও সাসানী ইত্যাদি জাতি এ শিল্পের প্রতি সেই প্রাচীন কাল থেকেই যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিল। গ্রিক জাতি শিল্প-সংস্কৃতিতে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তারা স্থাপত্য শিল্পেও বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। তারা এ শিল্পের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও শৈল্পিক দিকটির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিল। এ শিল্প নির্মাণের কৌশলও তারা আবিষ্কার করেছিল। অতঃপর

---

৩. Zillur Rahman Siddiqui edited, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 2008, p. 37

৪. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য*, রাজশাহী : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. ২

৫. W. R. Lethaby, *Architecture*, London : Macmillan and co., 1892, p. 8; উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করতে থাকে। ফলে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়েছে এবং তাতে তাদের ধর্মীয় দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম ধর্ম বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করে না। কারণ নবী স. বলেছেন,

إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ

আমাকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়নি।[৭]

ইসলাম মুসলিমদেরকে শিখিয়েছে যে, মানুষ চাইলে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হতে পারে, তার সন্তুষ্টি পেতে পারে, যদি তা দীনের শিক্ষা ও বিধান অনুযায়ী আদায় করা হয়। সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এবং তার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন নেই। দুনিয়াদারী ছেড়ে দিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার এবং দেহকে নানাভাবে কষ্ট দেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ কর্তৃক মানুষের জন্য প্রদত্ত কোন নিয়ামতকেও হারাম করার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মীয় দর্শনে দেখতে পাই যে, স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে হলে বৈরাগ্য সাধনা করতে হবে। দুনিয়ার ভোগ বিলাস ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে চলে যেতে হবে। সেখানে রাত দিন স্রষ্টার উপাসনায় ব্যস্ত থাকতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ছেড়ে দিয়ে; মানবদেহকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে স্রষ্টার ধ্যান উপাসনায় মগ্ন থাকলেই তবে পাওয়া যাবে স্রষ্টার সন্তুষ্টি। তাই এসব ধর্মে অনুসারীদেরকে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করে মানবদেহকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে পাহাড়ে-পর্বতে উপাসনায় ব্যস্ত হতে দেখা যায়।

উপর্যুক্ত এই দর্শনের প্রভাব আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর স্থাপত্য শিল্পেও। বিশেষত তাদের ইবাদত বন্দেগী ও পূজার জন্য নির্মিত বাড়ি-ঘরে। তাই আমরা মুসলিমদের মসজিদগুলো দেখতে পাই যে, তা নির্মিত হয় ভিতর-বাইরে অতি সহজভাবে এবং সাদাসিধে করে, তাদের ধর্মের শিক্ষা ও ধর্মীয় দর্শনের আলোকে। তার অভ্যন্তর ভাগে থাকে না তেমন কোন কারুকার্য, যাতে ভিতরে সালাতরত মুসলিমদের মন সে দিকে মগ্ন হয়ে না পড়ে। আর তার বাহির ভাগ নির্মিত হয় ইসলামী দর্শনের আলোকে প্রায় মিনারা বা আযানখানা সহকারে। আর তাও নির্মিত হয় জনগণের সমাবেশ স্থলে, সড়কের পাশে, বাজারে, চৌরাস্তার মোড়ে এবং এমন

---

৭. ইমাম আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, তাহকীক : ফাওয়ায আহমাদ যামরালী ও খালিদ আস-সাব' আল-'ইলমী, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আন-নাহী 'আনিত তাবাত্তুল, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি., হাদীস নং- ২১৬৯; হাদীসটির সনদ সহীহ। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৩৯৪।

সব স্থানে যেখানে সহজেই পৌঁছা যায়। আর তাতে রাখা হয় সামনের বা কিবলার দিক ছাড়া বাকি তিন দিকে পর্যাপ্ত পরিমাণের জানালা ও দরজা। যাতে তাতে প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে। অতএব, মুসলিমরা তাদের দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় ইবাদত বন্দেগীও আদায় করেন। তারা তাদের ধর্মীয় দর্শন মতে, তাদের ধর্মীয় এবং দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড একই সাথে তাদের প্রতিপালকের আদেশ-নিষেধ মতে আদায় করে তার নৈকট্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৮]

অন্য দিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মন্দির, মঠ ও গির্জাগুলো নির্মাণ করে পাহাড়ের চূড়ায়, জঙ্গলে এবং লোকালয় থেকে বহু দূরে। আর যদি লোকালয়ের মধ্যে নির্মাণ করা হয়; তবে তার স্থাপত্য রীতিটি করা হয় প্রায় অন্ধকার করে, যাতে মানব সমাজ থেকে অন্তত রূপকভাবে হলেও দূরে অবস্থান করে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থেকে তাতে একান্ত মনে উপাসনায় নিয়োজিত হওয়া যায়। এভাবেই হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা যেমন তাদের স্থাপত্য শিল্পগুলো তাদের ধর্মীয় দর্শনের আলোকে তৈরি করেছে, তেমনিভাবে মুসলিমরাও তাদের ধর্মীয় দর্শন অনুযায়ী তাদের ধর্মীয় ইবাদতের স্থান মসজিদগুলোর স্থাপত্য রীতি আলাদা করে নিয়েছে। ফলে তাদের নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়েছে।[৯]

আমরা যদি প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্য শিল্পগুলো দেখি তার সাথে গ্রিক স্থাপত্য শিল্পের তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এতদুভয়ের নির্মাণ কৌশলে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। প্রথমোক্তদের স্থাপত্য শিল্পগুলো যেমন আকারে বড়, তেমনি শক্ত মজবুতও বটে। তা থেকেই বুঝা যায় যে, তারা একটি ধর্মে দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাসী ছিল। তাদের জীবন-যাপন রীতি থেকে মনে হয়, তারা এ জীবনের পরে আরো একটি জীবনে বিশ্বাসী ছিল। অন্য দিকে গ্রিক জাতির স্থাপত্য শিল্পের দিকে তাকালে মনে হয়, তারা তা অতি সূক্ষ্মভাবে সুন্দর ও সুনিপুণভাবে তৈরি করেছে। কারণ তারা কেবল দুনিয়ার এ জীবনেই বিশ্বাসী ছিল। তদের জীবনযাপন রীতিতে যুক্তির প্রখরতা ও বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিফলন হয়েছে।[১০]

---

৮. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

৯. সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি., পৃ. ১৩৯

১০. ড. হামদি কোমাইস, *আত্তাযাওয়াক আল ফান্নি ওয়া দাওরুল ফান্নান ওয়াল মুস্তামতে*, আল-হাইয়্যাতুল 'আম্মা লি শুয়ূনুল মাতাবে আল আছারিয়া, তা. বি., পৃ. ৬৭

মোট কথা হলো, যে কোন জাতির স্থাপত্য শিল্পে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। তেমনিভাবে শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনও ঘটে। আর যে যুগে তা নির্মিত হয়েছে সে যুগের মন মানসিকতা চিন্তা-ভাবনাও তাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক যুগের আলাদা বিশেষ স্থাপত্য শিল্প তৈরি হয়। তাতে তাদের চিন্তা দর্শন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অর্থনৈতিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটে এবং তাদের জীবনবোধ ও সৌন্দর্যবোধ প্রতিভাত হয়।

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক; নেতিবাচক নয়। ইসলাম মুসলিমদেরকে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের অনুমোদন দেয়। তাতে শৈল্পিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোর অনুমোদনও দেয়। বাড়ি-ঘর এবং অট্টালিকা কারুকার্যময় করার অনুমতিও দেয়। তবে তা সবই হতে হবে অহংকার প্রকাশ না করার ও বিলাসিতা প্রকাশ না করার শর্তে এবং অপব্যয় ব্যতিরেকে। আল কুরআন এবং মহানবীর হাদীসে এর প্রতি বার বার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল-কুরআনে হুসূন (حُصُونُ)[১১] বা কিল্লা, সায়াসি (صَيَاصِي)[১২] বা দুর্গ, বুরুজ (البروج)[১৩] বা উচ্চ অট্টালিকা ও দুর্গ, কুসূর (قُصُور)[১৪] বা অট্টালিকা, গুরফ, (الغُرَفَ)[১৫] বা কক্ষ, জুদুর (جُدُرُ)[১৬] বা দেয়াল, সারুহ (الصَّرْحَ)[১৭] বা প্রাসাদ, কুরা মুহাস্সানা (قُرًى مُحَصَّنَة)[১৮] বা 'সুরক্ষিত জনপদ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১৯] যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾

> তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।[২০]

অর্থাৎ তোমরা সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গে অবস্থান করলেও তোমাদের মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমরা মৃত্যু থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না, পালাতে পারবে না। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা ও তাতে বসবাস করা বৈধ।

---

১১. আল-কুরআন, ৫৯ : ২
১২. আল-কুরআন, ৩৩ : ২৬
১৩. আল-কুরআন, ৮৫ : ১
১৪. আল-কুরআন, ৭ : ৭৪
১৫. আল-কুরআন, ২৫ : ৭৫
১৬. আল-কুরআন, ৫৯ : ১৪
১৭. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৪
১৮. আল-কুরআন, ৫৯ : ১৪
১৯. ড. হাসান আল বাশা, *মাদখাল ইলাল আসার আল ইসলামিয়া*, কাহেরা : দারুন নাহদা, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২১
২০. আল-কুরআন, ৪ : ৭৮

আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন,

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾

তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর'। অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং তার পায়ের নলাদ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান বললেন, 'এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ।'[২১]

এ আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, অতি উচ্চমানের শিল্পসম্মত সুরম্য বাড়ি ও প্রাসাদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ সুলাইমান আ. একটি স্বচ্ছ কাঁচের উচ্চমানের শিল্পসম্মত প্রাসাদ নির্মাণ করে তার তলদেশ দিয়ে পানি প্রবাহিত করেন। তা এমন সুকৌশলে নির্মাণ করেন যে, যারা এর সম্পর্কে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, তা পানি। অথচ পানি এবং পথচারীর মধ্যে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ রয়েছে। ফলে তার পায়ে পানি লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, সুলাইমান আ. নির্মিত এ প্রাসাদটিতে অতি উচ্চমানের শিল্প নৈপুণ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, এ জাতীয় শিল্পমানের প্রাসাদ তৈরি করা এবং প্রাসাদকে কারুকার্যময় করা, তাতে বসবাস করা ইসলামে বৈধ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

আর স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে আবাস দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর এবং যমীনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ো না।[২২]

উপর্যুক্ত আয়াতে "তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ" একথা বলার পর "সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর" এ কথা বলা থেকে বুঝা যায়, প্রাসাদ আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। প্রাসাদ তৈরি করা বৈধ না হলে তাকে আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হতো না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ স.ও তাঁর হাদীসে মু'মিনদেরকে এমন একটি অট্টালিকার সাথে তুলনা করেছেন, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। তিনি বলেন,

---

২১. আল-কুরআন, ২৭ : ৪৪

২২. আল-কুরআন, ৭ : ৭৪

إنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

নিশ্চয় এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ; যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[২৩]

রাসূলুল্লাহ স. তিনি সহ সকল নবী-রাসূলকে একটি সুউচ্চ ও সুন্দর অট্টালিকার সাথে তুলনা করে বলেন,

...فَقَالُوا مَا أَحْسَنَ بُنْيَانَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تَمَّتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ

তারা বললো, এ প্রাসাদের নির্মাণ কৌশল কতোই না চমৎকার হতো, যদি তাতে এই ইটটি বসানো হতো![২৪]

অট্টালিকা নির্মাণ বৈধ না হলে রাসূলুল্লাহ স. কখনো নবী-রাসূলগণকে এবং মুসলিমদেরকে অবৈধ ও হারাম একটি জিনিসের সাথে তুলনা করতেন বলে মনে হয় না। ইসলামী শিল্পকলার কিছু কিছু পাঠক মনে করেন, বাড়িঘর ইত্যাদি সুনিপুণভাবে নির্মাণ করা, কারুকার্যময় করা, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ ইসলাম দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতাকে অপছন্দ করে। ইসলাম মুসলিমদেরকে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যস্ত হতে আহ্বান জানায়। কাজেই ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িঘর তৈরি এবং তাতে কারুকার্য করতে নিষেধ করে।

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ অনেকেই মাকরূহ বলে মনে করেন। এ মত পোষণকারীগণের মধ্যে বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (২১-১১০ হি.) রহ. অন্যতম।[২৫] তাঁরা নবী স. এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন।

إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ هَوَانًا أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ وَالْمَاءِ وَالطِّينِ

আল্লাহ কোন বান্দাহকে অপদস্থ করতে চাইলে তখন তার সম্পদ বাড়ি-ঘর, পানি ও মাটিতে ব্যয় করেন।[২৬]

---

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ : তাশবীকুল আসাবি' ফিল মাসজিদ ওয়া গায়রিহী, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৬৭

২৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১৫, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং- ৯৩৩৭; হাদীসটির সনদ সহীহ।

২৫. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৩৯-২৪০

২৬. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি., হাদীস নং-১০৭২০; হাদীসটির সনদ যঈফ (দুর্বল); আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-২২৯৫

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه

যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি নির্মাণ করবে, কিয়ামত দিবসে সে তা তার ঘাড়ের উপর বহন করে নিয়ে আসবে।[২৭]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এটা আমারও অভিমত। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللهِ ضَامِنٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ

মুমিন যে অর্থই ব্যয় করে তার জন্য সে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে। তবে বাড়ি-ঘরের নির্মাণের জন্য যা ব্যয় করে বা আল্লাহর নাফরমানী করতে গিয়ে যা ব্যয় করে তার জন্য সে কোন উত্তম প্রতিদান পাবে না।[২৮]

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন,

لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ : بَيْتٌ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبٌ يُوارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفُ الخُبْزِ وَالمَاءِ

আদম সন্তানের জন্য কেবল এ জিনিসগুলো ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার হক নেই, বসবাসের জন্য একটি বাড়ি, সতর ঢাকার জন্য একটি পোশাক এবং রুটির টুকরা ও পানি।[২৯]

কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইবনুল আরত রা.-এর কাছে তাঁকে অসুখের সময় দেখতে গেলাম। তখন দেখলাম যে, তিনি তাঁর একটি দেয়াল তৈরি করছেন। তখন তিনি বললেন, 'মুসলিমকে সব কাজের জন্য প্রতিদান দেয়া হবে, কেবল এ মাটিতে যা করে তা ব্যতীত।' ইতিমধ্যে তার পেটে সাতবার আগুনের ছ্যাঁকা (থেরাপী) দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। (অপর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে) তারপর বলেন, আমাদের যেসব বন্ধু মারা গেছেন তাঁদের দুনিয়ার কোন কিছু তাঁদের ক্ষতি করতে পারেনি। আমরা তাঁদের পরে এমন কিছু পেয়েছি যা রাখার জন্য এ মাটি ছাড়া আর কিছু পাই না।[৩০]

---

২৭. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, মাওসিল : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., হাদীস নং-১০২৮৭; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল; আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াল তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১৭৬

২৮. ইমাম দারা কুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি., হাদীস নং-১০১; হাদীসটির সনদ যঈফ (দুর্বল); আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৯৮

২৯. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহ্দ, পরিচ্ছেদ : আয-যিহাদাহ ফিদ্দুনয়া, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৩৪১। হাদীসটির সনদ মুনকার; আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৬৩

৩০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মারযা, পরিচ্ছেদ : তামান্নাল মারীযি বিল-মাওতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৬৭

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ স. এর সাথে মদীনার রাস্তায় হাঁটছিলাম। তখন তিনি ইটের তৈরি একটি গম্বুজ দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার? আমি বললাম অমুকের। তখন তিনি বললেন, 'কিয়ামত দিবসে প্রতিটি বাড়ি তার মালিকের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তবে যা মসজিদ হিসেবে বানানো হয় বা মসজিদের ঘর হিসেবে বানানো হয় তা ব্যতীত। (আসওয়াদ নামক এক রাবী এ সন্দেহটি প্রকাশ করেছেন।) অতঃপর আবার একদিন সে পথে গেলেন তখন গম্বুজটি দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গম্বুজটি কী করা হয়েছে? আমি জবাব দিলাম, আপনি যা বলেছিলেন তা তার মালিক শুনেছিল। তাই তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন। তখন মহানবী স. বললেন, আল্লাহ তাকে দয়া করুন।'[৩১]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স. আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমরা আমাদের একটি ঝুপড়ি মেরামত করছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী করছ? আমরা বললাম, এটি আমাদের একটি ঝুপড়ি, যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা তা ঠিক করছি। তিনি বলেন, তখন মহানবী স. বললেন, তবে মৃত্যু এর চেয়ে আরো বেশি দ্রুতগামী।'[৩২]

উম্মে মুসলিম আল-আশজায়ীয়া রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একবার তার কাছে আসলেন। তখন তিনি একটি গম্বুজে ছিলেন, তখন মহানবী সা. বললেন, এটি কতইনা সুন্দর হতো যদি তাতে মৃত্যু না আসত! তিনি বলেন, তখন আমি তা অনুসরণ করতে থাকলাম।'[৩৩]

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ

৩১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ২৬, হাদীস নং- ১৩৩০১; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।
عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَرَأَى قُبَّةً مِنْ لَبِنٍ فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ لِفُلَانٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ هَدٌّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ شَكَّ أَسْوَدُ أَوْ أَوْ أَوْ ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ يَلْقَهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتْ الْقُبَّةُ قُلْتُ بَلَغَ صَاحِبَهَا مَا قُلْتَ فَهَدَمَهَا قَالَ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ

৩২. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৬, হাদীস নং- ৬৫০২; হাদীসটির সনদ সহীহ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصْلِحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا قُلْنَا خُصًّا لَنَا وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ الْأَمْرَ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ

৩৩. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪৫, পৃ. ৪৫৭, হাদীস নং- ২৭৪৬৫; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।
عَنْ أُمِّ مُسْلِمٍ الْأَشْجَعِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهَا وَهِيَ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَيْتَةٌ قَالَتْ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهَا

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ الْبِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ

সব খরচ আল্লাহর পথে খরচ বলে গণ্য হবে কেবল বাড়ির জন্য খরচ ব্যতীত। তাতে কোন কল্যাণ নেই।[৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন,

اتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ، فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ

তোমরা বাড়ি-ঘর নির্মাণে হারাম থেকে বিরত থাকো। কারণ তা সর্বনাশের মূল ভিত্তি।[৩৫]

ইবন হাজার আল আসকালানী রহ. বলেন,

وهذا كله محمول على مالا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر وقد اخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه اما ان كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا الا ما لا أي الا ما لا بد منه

যে সব বাড়িঘর বসবাসের জন্য প্রয়োজন নয়, যা মানুষকে ঠাণ্ডা গরম থেকে বাঁচায় না, সে সব বাড়ি-ঘরের ক্ষেত্রেই হাদীসগুলোর উর্পযুক্ত বক্তব্যগুলো প্রযোজ্য। আনাস রা. থেকে একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, 'সব বাড়ি-ঘর তার মালিকের জন্য ক্ষতিকর বলে পরিগণিত হবে, তবে যা তার বসবাসের জন্য আবশ্যক তা ব্যতীত।....

তিনি আরো বলেন,

... وكلامه يوهم ان في البناء كله الإثم وليس كذلك بل فيه التفصيل وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم ... وأن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الثواب والله سبحانه وتعالى اعلم

দাউদীর কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সব রকমের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা পাপ। আসলে ব্যাপার কিন্তু তা নয়। বরং এ ক্ষেত্রে কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যেসব বাড়ি-ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই নির্মাণ করা পাপ নয়। বরং এরূপ কিছু কিছু বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা ছাওয়াবের কাজ। যেমন যে বাড়ি-ঘর দ্বারা নির্মাতা ছাড়া অন্যরাও উপকৃত হয় তা দ্বারা নির্মাতা ছাওয়াব পাবেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[৩৬]

---

[৩৪] ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক ওয়ার ওরা', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৪১; হাদীসটির সনদ য'ঈফ।

[৩৫] ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৭২২; আল্লামা মুনাবী আল-জামি'উস সাগীরের শরাহয় বলেন, ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। খ. ১, পৃ. ৫৭

[৩৬] ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৯৩

শেখ আব্দুর রহমান আল-বান্না এসব হাদীসের উপর টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, 'এই অভিসম্পাত তাদের উপর অর্পিত হবে যারা দুনিয়াতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আশায় বা অহঙ্কার প্রকাশের জন্য বা গরিব-দুঃখী মানুষের সামনে বড় লোক বলে জাহির করার জন্য বা যারা দুনিয়াতে চিরদিন থাকার চেষ্টা করে, তাদের সাদৃশ্য ধারণের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যারা এরূপ করে তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾

আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা স্থায়ী হবে।[৩৭]

শেখ মুহাম্মাদ আল-গাযালী বলেন, 'যদি এসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হত; তাহলে কোন শহর-নগর ও গ্রাম গড়ে উঠত না। মানুষ ঝুপড়িতেই বসবাস করত। যেখানে তারা বিনা কষ্টে সতর ঢাকতে পারত না। সত্য কথা হলো: এসব হাদীস যারা নিজেদেরকে ধনী হিসেবে প্রকাশের জন্য বা গর্ব-অহঙ্কার প্রকাশের জন্য বা বড়লোক বলে জাহির করার জন্য বাড়ি-ঘর করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে অট্টালিকা নির্মাণ বৈধ।[৩৮]

সায়্যিদ সাবিক তার 'দাওয়াতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলেন, 'অট্টালিকা নির্মাণ ও তা কারুকার্যময় করা অপছন্দ করে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এসব হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, যারা তা অহঙ্কার প্রকাশ করার জন্য বা মানুষের সামনে নিজেকে বড়লোক বলে জাহির করার জন্য নির্মাণ করে, তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যারা কেবল সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করার জন্য তা তৈরি করে তাদের ক্ষেত্রে এসব হাদীস প্রযোজ্য নয়। কারণ তাতো সব সময় কাম্য।'[৩৯]

অতএব, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ ও তা কারুকার্যময় করা এবং তার সৌন্দর্য দেখে আনন্দ উপভোগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়; বৈধ। বরং তা কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়, যদি অহঙ্কার প্রকাশ বা নিজেকে বড়লোক বলে জাহির না করে নির্মাণ করা হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ স.-এর কোনো কোনো সাহাবীও বিনা দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রা. বসরায় একটি অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রা. বসরার গভর্নর ছিলেন। তিনি এ অট্টালিকা নির্মাণের পর বলেন, এ অট্টালিকা তো লোকদেরকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! এ সংবাদ ওমর রা. শুনার পর তিনি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাকে বসরায় পাঠান এবং তাকে আদেশ দেন, যেন তিনি বসরায় পৌঁছে

---

৩৭. আল-কুরআন, ২৬ : ১২৯

৩৮. মুহাম্মদ আল গাযালী, *মিয়াতু সাওয়ালিন আনিল ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ১৭৭-১৭৮

৩৯. সায়্যিদ সাবিক, *দাওয়াতুল ইসলাম*, বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা. বি., পৃ. ৩৬

বাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেন। তখন তিনি বসরা গিয়ে বাড়িটি আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। আল্লামা ইবন তাইমিয়ার মতে, ওমর রা. এ কাজটি করেছিলেন অট্টালিকা তৈরি ইসলামে নিষিদ্ধ বলে নয়, বরং তিনি তা করেছিলেন একজন গভর্নর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন বলেই। কারণ তিনি চাননি তার কোন গভর্নর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা না দেখে দায়িত্ব পালন করুক।[৪০]

সাহাবীদের পরে তাবি'য়ী, তাবে-তাবি'য়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে এবং তার পরবর্তী যুগেও মুসলিমরা পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। দুর্গ গড়ে তুলেছেন।

আমি মনে করি, কেবল নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাসের জন্য বহুতল অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা মাকরূহ থেকে মুক্ত নয়। তবে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে ভাড়া দিয়ে অর্থ রোজগার করার জন্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করা মাকরূহ নয়। বরং তা ছাওয়াবের কাজও হতে পারে, যদি মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধান কল্পে তা তৈরি করা হয়। বিশেষত তা যদি বড় বড় শহরগুলোতে তৈরি করা হয়। কারণ বর্তমান যুগে আমাদের এই ঢাকা শহরের মত শহরে বহুতল ভবন নির্মাণ করা না হলে; আরো দু চার দশটি ঢাকা শহরের মত শহরের প্রয়োজন হবে। তখন দেখা দিবে তীব্র ভূমি সংকট। ইসলাম এমন কোন সিদ্ধান্ত দেয় না, যা মানুষের সমস্যা বাড়ায়। ইসলাম এসেছে মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য, সমস্যা বাড়াবার জন্য নয়। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, 'যেখানেই মানব কল্যাণ সেখানেই ইসলাম'।

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলামের দিক নির্দেশনা

ইসলামী গবেষকগণ স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব মূলনীতি অবলম্বন করে স্থাপত্য শিল্প নির্মিত হওয়া আবশ্যক তার বিবরণও দিয়েছেন। আমরা এখানে পাঠকদের সামনে তা পেশ করছি :

১. স্থাপত্য শিল্প নির্মাণে ইসলামের নির্দেশিত সীমারেখা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মসজিদ নির্মাণের সময় অবশ্যই নবী স. কর্তৃক মাসজিদে নববী তৈরিকালে নির্ধারিত বিশেষ শিল্পরূপটির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাকে প্রায়

৪০. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি., মাজমু ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়া, খ. ৫, পৃ. ১১৮
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ بَنَى لَهُ بِالْكُوفَةِ قَصْرًا، وَقَالَ: أَقْطَعُ عَنِّي النَّاسَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُحَرِّقَهُ، فَاشْتَرَى مِنْ نَبَطِيٍّ حُزْمَةَ حَطَبٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ حَمْلَهَا إِلَى قَصْرِهِ، فَحَرَّقَهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِلْوَالِي الِاحْتِجَابَ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ وَلَكِنْ بُنِيَتْ قُصُورُ الْأُمَرَاءِ

চতুর্ভূজাকৃতি বিশিষ্ট করে ভিতরে বাইরে একেবারে সাদাসিধে করে তৈরি করতে হবে। কিবলা ছাড়া বাকি তিন দিকে দরজা জানালা রাখা যাবে। এটাই হলো ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের স্থাপত্য রীতি।

রাবেতা আলম আল-ইসলামী মসজিদের ডিজাইনে তার স্থাপত্য রীতি ও রূপ-রেখা অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক বলে মনে করে। এ কারণেই তারা গোটা বিশ্বের মুসলিমদেরকে মসজিদের স্থাপত্য রীতি ও রূপ-রেখা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে আমরা রাবেতার উপদেশাবলি পেশ করছি :

১) মসজিদকে মুসলিম সমাজের প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে হবে। কেননা ইসলামে সমাজের সকল জনহিতকর কার্যক্রম ধর্মীয় কর্তব্যের শামিল। কাজেই মসজিদের জন্য নির্বাচিত স্থানটি হবে একেবারে শহরের মধ্যে বা এমন উন্মুক্ত স্থানে যেখানে সকলেই সহজে যাতায়াত করতে পারে। তা শহরেই হোক কিংবা গ্রামে বা মহল্লায় বা কর্মস্থলে হোক।

২) মসজিদ সাদাসিধেভাবে তৈরি করতে হবে। যে পরিবেশে তা তৈরি করা হচ্ছে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য স্থাপত্য রীতিতে আধুনিক কলা কৌশলের ব্যবহার করা যাবে। যেমন:

ক) সালাতের স্থানটি এমন স্বাস্থ্যকর হতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস থাকে এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডাও না হয়; আবার অতিরিক্ত গরমও না হয়।

খ) মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রাখা যাবে, যেখানে তারা পুরুষদের সাথে মেলামেশা না করে যাতায়াত করতে পারে।

গ) মসজিদে সালাতের স্থান ছাড়াও একটি লাইব্রেরী, আর তাতে বসে লেখা-পড়া করার মত স্থান এবং একটি মিলনায়তন বা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করার জন্য হল ঘর রাখা যাবে।

ঘ) মসজিদের পাশে সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়, বিশেষত শীত-গ্রীষ্মের ছুটির সময় যাতে শিশুরা খেলা ধুলা করতে পারে, আনন্দ-বিনোদন করতে পারে সে জন্য খেলার মাঠ থাকতে পারে।

ঙ) মেয়েদেরকে ঘর রান্নার কাজ শেখাবার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ রাখা যাবে।

চ) মসজিদের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা দানের জন্য একটি ডিস্পেনসারী রাখা যাবে। মৃত মানুষদের গোসল দান ও কাফন পরাবার জন্য একটি আলাদা কক্ষ রাখা যাবে।

ছ) মসজিদ নির্মাণের সময় এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে মসজিদের সম্মান রক্ষা করা যায়। সুতরাং তা সিনেমা হল বা ক্লাব ইত্যাদির পাশে নির্মাণ করা ঠিক হবে না; যেখানে মসজিদের সম্মান রক্ষা করা যাবে না।

জ) মসজিদের পাশে মসজিদ সংলগ্ন মুসাফিরখানা থাকতে পারে, যেখানে বিদেশি মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা ও মেহমানদারী করার ব্যবস্থা থাকবে।

২. পর্দার ব্যবস্থা থাকা

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের সময় যে সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় তার আর একটি হলো বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে মুসলিমদের পর্দা রক্ষা করা সহজতর হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সতর ঢাকতে ও পর্দা করতে আদেশ দিয়েছেন। মানুষের নজরের বাইরে থাকতে বলেছেন। অন্যের বাড়ি-ঘরে পূর্বানুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। যে ঘরে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের কোন ভোগসামগ্রী থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।[৪১]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

যদি কেউ তোমার বাড়ির অভ্যন্তরে তোমার অনুমতি বিহীন চোখ দেয়; আর তুমি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে তার চোখ কানা করে দাও; তাহলে তোমার কোন দোষ হবে না।[৪২]

---

৪১. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৯

৪২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : মান আখাযা হাক্কাহু আও ইকত্সসা দূনাস সুলতানি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪৯৩

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্যের বাড়ির অভ্যন্তরে তার অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া অপরাধ। তেমনিভাবে এ হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করা যে, বাহির থেকেই তার অভ্যন্তরের সব কিছু এমনিতেই দেখা যায়, তাও অপরাধ।

৩. প্রশস্ত করে তৈরি করা

বাড়ি ঘর নির্মাণের সময় তৃতীয় যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে প্রশস্ত করে তৈরি করা। কারণ রাসূলুল্লাহ্ স. চাইতেন তার বাড়ি ঘর প্রশস্ত হোক। তিনি বাড়ি–ঘর প্রশস্ত হওয়াকে সৌভাগ্য বলেও মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

أربع من السعادة : المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء

চারটি জিনিস সৌভাগ্যের প্রতীক, সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোক, প্রশস্ত বাড়ি-ঘর, সৎ প্রতিবেশী এবং ধৈর্যশীল বাহন।[৪৩]

তিনি প্রায় সময় এ দু'আটি পড়তেন,

اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

হে আল্লাহ্ আমার পাপ ক্ষমা করে দিন, আমার বাড়ি-ঘর প্রশস্ত করে দিন, আর আমার রিয্‌কে বরকত দিন।

এ দু'আ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি এ দু'আটি কত বেশিই না করেন? তখন তিনি বললেন, কল্যাণের আর কিছু চাইতে বাকি আছে কি?[৪৪]

৪. বসবাসকারীর মনস্তুষ্টি

স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ইসলাম যে সব নির্দেশনা দেয়, তার মধ্যে আর একটি হলো বসবাসকারীর মনস্তুষ্টি অর্জিত হওয়া। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বসবাসকারী সেখানে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে বাস করতে পারে। সে সেখানে সামাজিক নানা বাধা অতিক্রম করে মুক্ত হয়ে তার একান্ততা (privacy) ও স্বাধীনতা রক্ষা করে বসবাস করতে পারে, শান্তি পায় এবং আরামে জীবন যাপন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি তার করুণা ও দয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

---

৪৩. ইমাম ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ্,* অধ্যায় : আন-নিকাহ্, বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., হাদীস নং- ৪০৩২। হাদীসটি সাহীহ। দ্র. আল-আলবানী, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ্,* হাদীস নং- ২৮২

৪৪. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান,* তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ্, পরিচ্ছেদ : মা ইয়াকূলু ইযা তাওয়াযযাআ, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং- ৯৯০৮। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আল-আলবানী, *গায়াতুল মারামি ফী তাখরীজি আহাদীছিল হালালি ওয়াল হারাম,* বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৮৭, হাদীস নং- ১১২

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য শান্তির আবাস বানিয়েছেন।[৪৫]

উপর্যুক্ত আয়াতের 'সাকান' শব্দটি 'সাকুনা' থেকে এসেছে, যার অর্থ সান্ত্বনা ও প্রশান্তি অর্থাৎ বাড়ি-ঘরকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের শান্তির নীড় হিসেবে বানিয়েছেন। যাতে আমরা সেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। সুতরাং বাড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সেখানে শান্তির সাথে বসবাস করা যায়।

৫. সাদাসিধে ও বিলাসিতামুক্ত ভাবে তৈরি করা

বড়ি-ঘর এমনভাবে তৈরি হতে হবে, যাতে তা সাদাসিধে ও বিলাসিতামুক্ত হয়। কারণ ইসলাম মুসলিমদেরকে সকল ক্ষেত্রে সাদাসিধে বিলাসিতাহীন জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করে। এই বিলাসিতা মুক্ত জীবনযাপনের মধ্যে আছে বাড়ি-ঘর বিলাসিতা মুক্ত সাদাসিধেভাবে তৈরি করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের সুন্দর পরিচ্ছেদ পরিধান কর এবং খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪৬]

অপচয় বলতে বুঝানো হয় আল্লাহ্ যেখানে অর্থ ব্যয় করা হারাম করেছেন সেখানে অর্থ ব্যয় করা এবং এমন সব কাজে অর্থ ব্যয় করা যা বিলাসিতা ও অপ্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত হয়। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার কামনা করে। তাই ইসলাম অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্থ ব্যয় করা পছন্দ করে। সুতরাং বাড়ি-ঘর তৈরিতে ন্যায়ানুগভাবে কারুকার্য করাও ইসলাম অনুমোদন করে; তবে তা হতে হবে অবশ্যই বিলাসিতা পরিহার করে ন্যায়পরায়ণতার সীমারেখার মধ্যে।

৬. মজবুত ও সুন্দর করা

ইসলাম মুসলিম স্থপতির কাছে দক্ষতার সাথে উৎকর্ষের সাথে মজবুত ও সুন্দর করে স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ করা কামনা করে। কারণ রাসূলুল্লহ স. এক হাদীসে বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

---

৪৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৮০

৪৬. আল-কুরআন, ৭ : ৩১

তোমরা কেউ কোন কাজ করলে সে তা উৎকর্ষ ও দক্ষতার সাথে করুক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।[৪৭]

৭. আল্লাহর খলীফা হিসেবে মানুষের দায়িত্বের কথা ভুলে না যাওয়া

ইসলামী স্থাপত্য শিল্প তৈরি কালে মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা। সুতরাং স্থপতিকে তার স্থাপত্য শিল্প এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে স্থাপত্য শিল্পটি মানবকল্যাণ ও আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও আল্লাহ ইবাদতে উৎসাহী করে।

৮. বাথরুম (টয়লেট) কিবলামুখি না করা

স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের সময় আর যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তা হচ্ছে বাড়ির অভ্যন্তরে টয়লেটগুলো যেন কিবলামুখি করে না করা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ স. পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলামুখি হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا

তোমরা কিবলামুখি হয়ে বা কিবলাকে পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাব করো না।[৪৮]

৯. কবরের উপর কোন ধরনের স্থাপত্য তৈরি না করা :

মুসলিমদের কবর হবে সাদাসিধে। এটি বেশি উঁচু করা যেমন হারাম, তেমন হারাম করবের উপর কোন স্থাপত্য নির্মাণ করা, কবর বাঁধানো, চুনকাম করা ইত্যাদি।

জাবির রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

রাসূলুল্লাহ সা. কবরে চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[৪৯]

---

৪৭. ইমাম আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দামেশ্‌ক : দারুল মামূন লিত্-তুরাছ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি., হাদীস নং-৪৩৮৬; হাদীসটির সনদ সহীহ। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১১৩

৪৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আবওয়াবুল কিবলাহ, পরিচ্ছেদ : কিবলাতু আহলিল মাদীনাহ্ ওয়া আহলিশ্ শাম ওয়াল মাশরিকি..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৬

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন তাজসীসিল কবরি ওয়াল বিনা-ই আলাইহি, হাদীস নং-২২৮৯

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা হারাম। তাই কোন ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে কোন স্থাপনা তৈরি, এমনকি কবর বাঁধানো ও চুনকাম করা, কবরের উপর কিছু লেখা, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি স্পষ্ট হারাম।

উপসংহার

স্থাপত্য শিল্প তৈরি করার সময় তাতে উন্নত নির্মাণ শিল্প কৌশল ব্যবহার করে, মজবুতভাবে, শান্তিতে বসবাস করতে পারার মত করে এবং ইবাদত-বন্দেগী, বিশেষত সালাত আদায়ের পরিবেশ তৈরি করে তা নির্মাণ করতে হবে। আরো খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেখানে দীনের বিধান রক্ষা সহজতর হয়। আরো মনে রাখতে হবে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসে নি, তাকে তার রবের কাছে অবশ্যই একদিন আবার ফিরে যেতে হবে। অতএব, স্থাপত্য শিল্প নির্মাণ কালে এ কথা মনে রেখেই তা তৈরি করতে হবে। তাতে বাড়াবাড়ি ও বিলাসিতা যাতে না হয়, তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবেই স্থাপত্য শিল্প ইসলামসম্মত হবে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি মুসলিম দেশ। এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলিম। তাই এদেশের স্থাপত্য শিল্প অবশ্যই ইসলামী স্থাপত্য শিল্প-নীতিমালা অনুসরণ করে নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয়। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন স্থাপত্য কর্ম শিল্প বা সংস্কৃতির নামে তৈরি করা এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান কখনই কাম্য হতে পারেনা। এ প্রেক্ষিতে দেশের স্থাপত্য শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধকে ধারণ করে এমন একটি আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবী। উল্লেখ্য যে, এ দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ হলেও অমুসলিম জনগোষ্ঠীর শিল্প, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে। যা বিশ্বধর্ম ইসলামের উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামী নির্দেশনা মত স্থাপত্য শিল্প তৈরি করার তাওফীক দিন।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ও শর্তাবলি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়

মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *কোন বিষয়ে ইসলামী বিধান জানার নিমিত্তে ফাত্ওয়া দেয়া-নেয়া মুসলিম সমাজের মৌলিক একটি বিষয়। যারা জানে না তাদেরকে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়ার জন্য কুরআন কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে মুফতীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা অতীব জরুরী। সম্প্রতি ফাত্ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি আপিল বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ফাত্ওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিবেচনায় সুপ্রিমকোর্টের রায়ের পাশাপাশি ফাত্ওয়া সংশ্লিষ্ট আলোচনা নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত রায় বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফাত্ওয়ার পরিচয়, গুরুত্ব, সংবেদনশীলতা, ফাত্ওয়া প্রদানকারীর যোগ্যতা, ফাত্ওয়া প্রদানের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বিষয় বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরিখে সারণি এবং চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস, এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সময়ের আবর্তনে সংঘটিত ফাত্ওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনা বাংলাদেশের জনসমাজে ফাত্ওয়ার ব্যাপারে যে ভয়-ভীতি কিংবা ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে, তা দূরীকরণে এ প্রবন্ধ সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামের বিধান জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানব সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা যে ফাত্ওয়া প্রদানের মূল লক্ষ্য, এ প্রবন্ধ পাঠে পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন।*]

মূলশব্দ : ফাত্ওয়া, জনকল্যাণ, নীতিমালা, শর্তাবলি, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট।

১. ভূমিকা

ফাত্ওয়া (Formal and legal opinion) বলতে মূলত কোন প্রশ্ন কিংবা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম আইনবিদ প্রদত্ত বিধান বা সমাধানকে বুঝানো হয়ে থাকে।[১]

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ফিক্‌হ ও উসূল আল-ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

১. মুহাম্মদ রাওয়াস কাল'আজী, এবং হামিদ সাদিক ক্বানিবী, *মু'জাম লুগাত আল-ফুক্বাহা*, বৈরূত : দারুন নাফায়িস, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ২৫৪ (আল-ফাতওয়া)

الحكم الشرعي الذي يبينه الفقيه لمن سأله عنه

ফাত্ওয়ার আদান-প্রদান মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের ইসলামী বিধান জানা না থাকলে তাকে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তাদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া অনুযায়ী নিজের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হবে। ফাত্ওয়ার পরিধি অনেক ব্যাপক। জীবন দর্শন থেকে শুরু করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সকল বিভাগেই রয়েছে এর বিচরণ। সাধারণত ফাত্ওয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক: ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কিত, যা ইবাদাত, পারস্পরিক লেন-দেন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত এবং তা রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে কোনরূপ সাংঘর্ষিক নয়। দুই: আইন ও দণ্ডবিধি সম্পর্কিত, যা সরকার, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়।[২]

মহানবীর স. (মৃ. ১১ হি.) যুগ হতেই ফাত্ওয়ার সূচনা হয়। বিভিন্ন ঘটনা কিংবা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, ইলহাম এবং কখনো নিজস্ব ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাত্ওয়া দিতেন। রাসূলের স. উপস্থিতিতে এবং পরবর্তীতে তাঁর তিরোধানের পরে সাহাবীদের মধ্যেও ফাত্ওয়া প্রদানের রীতি প্রচলন ছিল। ইবনু উমর রা. (মৃ. ৭৩ হি.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলের স. যুগে আবু বকর রা. (মৃ. ১৩ হি.) এবং উমর রা. (মৃ. ২৩ হি.) ফাত্ওয়া দিতেন। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বলেন : রাসূলের স. সময়ে আবু বকর, উমর, উসমান (মৃ. ৩৫ হি.) ও আলী (মৃ. ৪০ হি.) রা. প্রমুখ ফাত্ওয়া দিতেন।[৩] তবে উল্লেখ্য যে, সাহাবীদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন, তিনি সে বিষয়ে ফাত্ওয়া দিতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন:

> من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب و من أراد أن يسأل عن الحلال و الحرام فليأت معاذ بن جبل و من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت و من أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإني له خازن.
>
> তোমাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করতে চায়, সে যেন উবাই ইবনে কা'বকে (মৃ. ৩০ হি.) জিজ্ঞেস করে, যে হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে চায় সে যেন মু'য়ায ইবনে জাবালকে (মৃ. ১৮ হি.) জিজ্ঞেস করে, যে মীরাসের বিধান জানতে চায় সে যেন যায়েদ ইবনে সাবিতের (মৃ. ৪৫ হি.)

---

২. প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, আল-ইফতা : একটি পর্যালোচনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : *জার্নাল অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিজ*, জুন ১৯৯৯, খ. ১৫, পৃ. ১২৫

৩. আবদুর রায্যাক আবদুল্লাহ সালিহ আল-কিনদী, *আত-তাইছীর ফিল ফাতওয়া, আসবাবুহু ও দাওয়াবিতুহু*, বৈরূত : মুয়াছ্ছাছাত আল-রিসালাহ, ২০০৮, পৃ. ৩৩

> শরণাপন্ন হয় এবং যে ধন-সম্পদ সম্পর্কিত প্রশ্ন করতে চায় সে যেন আমার নিকট আসে; কারণ আমি হচ্ছি এর তত্ত্বাবধায়ক।[৪]

সাহাবীদের পরবর্তী যুগে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ অনুসারীগণ ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। এ যুগে আল-ইফতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ যুগে তাবি'ঈগণ মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর ও বাগদাদ ইত্যাকার প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোতে ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন।[৫] এ ধারাবাহিকতায় ফাত্ওয়া প্রদানের কার্যক্রম চলতে থাকে। প্রতিটি যুগে সে সময়কার বড় মুজতাহিদ এবং অভিজ্ঞ মুসলিম আইনবেত্তাগণ ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে ইসলামী খিলাফতের পতন এবং ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে ফাত্ওয়া প্রদানের কার্যক্রম সরকারী প্রতিষ্ঠানের পদমর্যাদা হারিয়ে বেসরকারী পর্যায়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসে।[৬] কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করার পরিপ্রেক্ষিতে দু'এক ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়া অনেকাংশে অসম্ভব হয়ে পড়ার কারণে ফাত্ওয়া প্রদান আবার তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ফিরে পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের চেয়ে সামষ্টিক ইজতিহাদের কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে। সামষ্টিকভাবে ফাত্ওয়া দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে ফিক্হ একাডেমি, ফাত্ওয়া কাউন্সিল ইত্যাদি গড়ে উঠেছে, সম্মিলিতভাবে অর্জিত সমাধান লাভের আশায় দেশে-বিদেশে ফিক্হী সেমিনার, কনফারেন্স আয়োজন করা হচ্ছে এবং সর্বোপরি বিশ্বের অনেক দেশে ইফতাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়ে এর জন্য প্রশাসনিক এবং আর্থিক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

২. সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষাপট ও সংক্ষিপ্তসার

অযোগ্য ও অদক্ষ ব্যক্তিদের প্রদত্ত ফাত্ওয়া বাংলাদেশের জনজীবনে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে। এ রকম একটি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে "শহীদা" নামের গ্রাম-বাংলার এক গৃহবধু। ২০০০ খ্রি. সালে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, তার স্বামী তাকে ডিভোর্স দিয়েছিল, পরবর্তীতে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে স্থানীয় মুফতী ফাত্ওয়া দেন যে, এ জন্য তাকে

---

৪. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাকিম আল-নিসাবুরী, *আল-মুসতাদরাক আলা আস্-সাহীহাইন*, অনুচ্ছেদ : যিক্র মানাক্বিব আহাদিল ফুকাহা আস-সিত্তাহ মিনাস্-সাহাবাহ, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তাহকীক: মুস্তফা আবদুল কাদির, ১৯৯০, খ. ৩, পৃ. ৩০৪, হাদীস নং ৫১৮৭। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তারা তাদের গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করেননি।

৫. ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের, আল-ইফতা : একটি পর্যালোচনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

অবশ্যই তৃতীয় কোন ব্যক্তির বিবাহোত্তর ডিভোর্সপ্রাপ্তা হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে 'শহীদা'কে তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া হয়। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এ ঘটনা বাংলাদেশ হাইকোর্টের দৃষ্টিগোচর হলে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত হয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে ফাত্ওয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না-এ মর্মে রুল জারি করে। পরবর্তীতে দু'টি মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র ফাত্ওয়া প্রদানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। এর ফলশ্রুতিতে জানুয়ারি ২০০১ সালে হাইকোর্ট সকল প্রকার ফাত্ওয়া প্রদান এবং ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে কাউকে শাস্তি প্রদান অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়।[৭] পরবর্তীতে হাইকোর্টের এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা হলে মে ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্ট ফাত্ওয়া প্রদান সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে,[৮] যার সারমর্ম হচ্ছে, ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ; কিন্তু শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরাই ফাত্ওয়া দিতে পারবে এবং ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে কাউকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান কিংবা কারো মৌলিক কোন অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না, যা বাংলাদেশের আইনে সুরক্ষিত।[৯]

সম্প্রতি ফাত্ওয়া সম্পর্কে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত উক্ত রায় লিখিত আকারে আপিল বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতামতের ভিত্তিতে যে রায় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> Fatwa on religious matters only may be given by the properly educated persons which may be accepted only voluntarily but any coercion or undue influence in any form is forbidden.
>
> ধর্মীয় বিষয়াদিতে শুধুমাত্র যথাযথ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ফাত্ওয়া দিতে পারবেন। ফাত্ওয়া শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্য; তাই কোন ধরনের বল প্রয়োগ কিংবা অবৈধ প্রভাব প্রয়োগ করা এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ।
>
> But no person can pronounce fatwa which violates or affects the rights or reputation or dignity of any person which is covered by the laws of the land.

---

৭. রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় প্রদানের তারিখ ১ জানুয়ারি, ২০০১

৮. সিভিল আপিল নং ৫৯৩-৫৯৪/২০০১, রায় প্রদানের তারিখ ১২ মে, ২০১১

৯. আশুতোষ সরকার, Fatwa legal, not to be imposed; ১৩ মে, ২০১১ http://archive.thedailystar.net/newDesign/newsdetails.php?nid=185458 1/3, সংগ্রহের তারিখ, ২৮.০২.২০১৫

কোন ব্যক্তির অধিকার বা খ্যাতি বা মর্যাদা বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা দেশের আইনে সংরক্ষিত, এমন ফাত্‌ওয়া প্রদান করা যাবে না।

No punishment, including physical violence and/or mental torture in any form, can be imposed or inflicted on anybody in pursuance of fatwa.

ফাত্‌ওয়ার মাধ্যমে কাউকে কোন ধরনের শারীরিক বা মানসিক কোন কষ্ট দেয়া যাবে না।

The declaration of the High Court Division that the impugned fatwa is void and unauthorized, is maintained.

সুপ্রিমকোর্ট পূর্বে উল্লেখিত ফাত্‌ওয়াটি সম্পর্কে হাইকোর্টের বাতিলকৃত ও কর্তৃত্ববহির্ভূত মর্মে দেয়া রায় বহাল রাখেন।[১০]

ফাত্‌ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় বাংলাদেশের জন-জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক একটি অর্জন। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে না জেনে বা বিধানের গুরুত্ব না বুঝে অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ লোকদের প্রদত্ত ফাত্‌ওয়া বাংলাদেশের সমাজ জীবনে সময়ে সময়ে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় তা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ১৩৮ পৃষ্ঠার এ রায়ে যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, তন্মধ্যে নাগরিকদের মান-মর্যাদা ও খ্যাতি রক্ষার বিষয়টি অন্যতম। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের মানবোচিত মান-মর্যাদা ইসলামে সুরক্ষিত। তাই মানুষের মান-মর্যাদা বিনষ্ট করে, অধিকার লঙ্ঘন করে এমন ফাত্‌ওয়া দেয়া ইসলামেও অনুমোদিত নয়। ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এসব বিধান হয় মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে অথবা তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন বিষয় তাদের থেকে দূর করে। তাই ফাত্‌ওয়ার মাধ্যমে কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে যদি কারো ক্ষতি হয়, তাহলে সেই ফাত্‌ওয়া অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং তা প্রত্যাখ্যাত হবে। ফাত্‌ওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামের বিধান পালনে মানুষকে সহযোগিতা দেয়ার পাশাপাশি জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

তোমাদের জন্য কষ্টকর কোন বিষয়কে আল্লাহ দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি।[১১]

---

[১০] বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, আপিল বিভাগ, সিভিল আপিল নং ৫৯৩-৫৯৪/২০০১, *Judgement on Fatwa* , পৃ. ১৩৭-১৩৮

[১১] আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জনকল্যাণ (*মাসলাহা*) তিন প্রকার।

এক : এমন ধরণের কল্যাণ, যা ইসলামী আইনে স্বীকৃত এবং বৈধ। যেমন: বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ, নেশাজাতীয় পানীয় হারাম করার মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ ইত্যাদি।

দুই : এমন কল্যাণ, ইসলামে যার বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেমন: সুদ নিষিদ্ধকরণ; যদিও এটা উপার্জনের একটি মাধ্যম। তদুপরি এ জাতীয় কল্যাণ ইসলামী আইনে বৈধ নয়।

তিন : এমন কল্যাণ, যার বৈধতা কিংবা অবৈধতার ব্যাপারে ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। এ জাতীয় কল্যাণকে ইসলামী আইনে *"মাসালিহ মুরসালাহ"* বা জনকল্যাণ (public interest) বলা হয়। হালাল কিংবা হারাম হিসেবে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত গুটিকয়েক বিষয় ব্যতিরেকে মানবজীবনের বাকী সকল বিষয়ই মূলত এ জাতীয় কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে, এ জাতীয় কল্যাণগুলো মূলত হালাল এবং বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলোর মাধ্যমে ইসলামের সুস্পষ্ট কোন বিধানের লঙ্ঘন হয়।[১২]

এটাই হচ্ছে মূলত ইসলামী আইনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। ইসলাম গুটিকয়েক বিষয় সুস্পষ্ট হালাল ও হারাম করার মাধ্যমে কতিপয় সর্বজনীন মূলনীতিসহ বাকী পুরো জগৎ মানুষের প্রয়োজনীয়তা, কল্যাণ এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যই ইসলামী আইনকে গতিশীলতা দান করেছে এবং এর মাধ্যমে ইসলামী আইন কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের সমাধান দিতে সক্ষম হবে। এ বিষয়গুলোকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় (العفو) *"আল-আফউ"* তথা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী আইনের মৌলিক কোন বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে এগুলো বৈধ হবে।[১৩] আবূ ছা'লাবাহ আল-খুশান্নী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عنها

---

১২. আবদুল আলী মুহাম্মদ ইবনে নিযাম উদ্দীন, *ফাওয়াতিহ আর-রাহমূত শরহে মুসাল্লাম আস-সুবূত*, বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ২০০২, খ. ২, পৃ. ৪৭৫; মুহাম্মদ তাওফীক রমাদান আল-বুতী, উসূল আল-ফাতওয়া আশ-শার'য়ীয়্যাহ ওয়া খাসায়িসুহা, *মাজাল্লাত জামেয়াত দিমাস্ক লিল উলুম আল-ইকতিসাদিয়্যাহ ওয়াল কানুনিয়্যাহ*, ২০০৯, ভলিউম ২৫, খ. ২, পৃ. ৬৯৮

১৩. আবু ইসহাক আশ-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফি উসূল আশ-শারীয়াহ*, বৈরূত : আল-মাকতাবাহ আল-আসরীয়্যাহ, ২০০০, খ. ১, পৃ. ১০৮; ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, *উসূল ফিক্হ আল-ইসলামী*, দামেস্ক : দারুল ফিক্র, ১৯৮৬, খ. ১, পৃ. ৯০-৯১

নিশ্চয় আল্লাহ কিছু বিষয় আবশ্যিক করেছেন, তোমরা তাতে অবহেলা করো না; কতিপয় সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না; কিছু বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন, তোমরা তা স্পর্শ করো না এবং কিছু বিষয়ের ব্যাপারে ইচ্ছে করে আল্লাহ নীরব থেকেছেন, সুতরাং তোমরা সেগুলোর বিধান অনুসন্ধান করো না।[১৪]

এ জন্যই যে সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই সেক্ষেত্রে অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

মুসলিমদের মধ্যে জঘন্যতম অপরাধী হলো সেই ব্যক্তি, যে এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলো, যা মুসলিমদের জন্য হারাম ছিল না; কিন্তু তার প্রশ্নের কারণে তা হারাম করা হলো।[১৫]

ফাতওয়া সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান জানানো তথা ফাত্ওয়ার পরিচয়, ফাত্ওয়া দেয়ার যোগ্যতা, নিয়ম-নীতি, শর্তাবলি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়েই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ, যা সুপ্রিমকোর্ট প্রদত্ত রায় বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

৩. ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা ও পরিচয়

'ফাত্ওয়া' (الفَتْوَى) শব্দটি আরবী। 'আল-ফুতয়া' (الفُتْيا) ও 'আল-ফুতওয়া' (الفُتْوَى) শব্দরূপগুলোও আরবীতে 'ফাতওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৬] এর বহুবচন হচ্ছে 'আল-ফাতাওয়া'। শাব্দিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে: কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া বা কোন বিষয়ের সমাধান দেয়া, হউক তা ইসলামের বিধি-বিধান অথবা অন্য কোন বিষয় সংক্রান্ত। মিসরের বাদশাহর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾

হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক।[১৭]

কারাগারে ইউসুফের আ. সঙ্গীর ঘটনা বর্ণনায় আল্লাহ বলেন:

﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

---

১৪. আবুল হাসান আলী ইবনে উমর, *সুনান আদ্-দারেকুতনী*, অনুচ্ছেদ : আর-রিদা', দিল্লী : মাতবাআত আল-আনসার, ১৩০৬ হিজরী, খ. ১০, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং-৪৪৪৫। হাদীসটি হাসান পর্যায়ের

১৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : তাওক্বীরিহি ওয়া তারক্ ইকছার সুয়ালিহি, বৈরূত : দারুল জীল, তা. বি., খ. ৭, পৃ. ৯২, হাদীস নং-৬২৬৫

১৬. ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, খ. ১৫, পৃ. ১৪৫

১৭. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩

সে তথায় পৌঁছে বলল: হে ইউসুফ! হে মহা সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী- তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি।[১৮]

অন্যত্র সাবা সম্প্রদায়ের রাণীর কথা বলতে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

বিলকীস বলল: হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।[১৯]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে এমন সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে 'ফাত্ওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা শরীয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত নয়। অপরদিকে কুরআন কারীমের অন্যত্র শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে 'ফাত্ওয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

হে নবী! তারা আপনার নিকট নারীদের ব্যাপারে জানতে চায়, আপনি বলুন: আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বিধান দিচ্ছেন।[২০]

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾

হে নবী! মানুষ আপনার নিকট ফাত্ওয়া জানতে চায়, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন।[২১]

ইসলামের বিধি-বিধান জানতে চাওয়া অর্থে 'ফাতওয়া' শব্দের ব্যবহার পূর্বক রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ

তোমাদের মধ্যে যারা ফাত্ওয়া প্রদানে সবচেয়ে বেশি দুঃসাহস দেখায়, মূলত তারা জাহান্নামের আগুন গ্রহণে সকলের চাইতে বেশি দুঃসাহসী।[২২]

---

১৮. আল-কুরআন, ১২ : ৪৬

১৯. আল-কুরআন, ২৭ : ৩২

২০. আল-কুরআন, ৪ : ১২৭

২১. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৬

২২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান, *সুনান আদ্-দারেমী*, অনুচ্ছেদ : আল-ফুতয়া ওয়া মা ফিহি মিন আশ-শিদ্দাহ, দিল্লী, ১৩৩৭ হিজরী, খ. ১, পৃ. ১৮০, হাদীস নং-১৫৯; হাদীসটির সনদ যঈফ; *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ...*, হাদীস নং-১৮১৪

মূলত ফাত্ওয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত : ফাতওয়া তাশরী'য়ী (الفتوى التشريعي) বা আইন প্রণয়নমূলক ফাত্ওয়া। এ ধরনের ফাত্ওয়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে থাকে। যেমন: কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

হে নবী! তারা আপনাকে নারীদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে থাকে, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ তাদের বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করাবে।[২৩]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾

তারা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলে দিন, এটি হচ্ছে মানুষের জন্য (একটি স্থায়ী) সময় নির্ঘন্ট এবং হজ্জের সময়সূচিও।[২৪]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾

তারা আপনাকে পবিত্র মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আপনি বলে দিন এ মাসে লড়াই করা অনেক বড় গুনাহ।[২৫]

ইত্যাকার বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ফাত্ওয়া স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্ স. কর্তৃক প্রদত্ত ফাত্ওয়ার উদাহরণ হচ্ছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّى عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

ইবনে 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, জুহাইনাহ গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলের স. নিকট এসে বলল: আমার মা হজ্জ আদায় করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ আদায় করার পূর্বেই তিনি মারা যান, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারব? রাসূলুল্লাহ্ স. বললেন: হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবে; তোমার মায়ের উপর যদি কারো কোন ঋণ থাকতো তুমি কি তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করতে না! সুতরাং আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও, কারণ আল্লাহর হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য।[২৬]

---

২৩. আল-কুরআন, ৪ : ১২৭

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৮৯

২৫. আল-কুরআন, ২ : ২১৭

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হজ্জ, অনুচ্ছেদ : আল-হাজ্জ ওয়া আন-নুযুর আনিল মাইয়্যিত, কায়রো : মাতবাআত আল-আমিরিয়াহ, ১২৮৬ হিজরী, খ. ৭, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ১৮৫২

দ্বিতীয়ত : ফাত্ওয়া ফিক্‌হী (الفتوى الفقهي) বা ফিক্‌হী বিধি-বিধান সম্বলিত ফাত্ওয়া, যা ফিক্‌হ বিশারদগণ প্রদান করে থাকেন। এ ধরনের ফাত্ওয়া বিশেষ কোন ঘটনার আলোকে প্রদান করা হয় না; বরং শরীয়াতের মৌলিক কোন বিষয় আলোচনা করার প্রাক্কালে এর উদাহরণ, ব্যবহার ও প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে প্রাসঙ্গিক বিধান হিসেবে এ সকল ফাত্ওয়া বা সমাধান প্রদান করা হয়ে থাকে। এগুলোকে সাধারণত ফিক্‌হী অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে নামকরণ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : ফাতওয়া জুয'য়ী (الفتوى الجزئي), যা বিশেষ কোন প্রশ্ন, কোন ঘটনা ইত্যাদিকে সামনে রেখে প্রদান করা হয়ে থাকে।[২৭] মূলত ফাত্ওয়ার তৃতীয় এ প্রকারটি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফাত্ওয়া এবং ক্বাদ্বা (قضاء) তথা আইনী সিদ্ধান্ত দু'টি ভিন্ন বিষয়। কোন প্রশ্ন বা ঘটনার আলোকে যে মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে, যেখানে শুধুমাত্র শরীয়াতের বিধান যেমন: ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় তা ফাত্ওয়া হিসেবে পরিচিত। অপরদিকে কোন বিষয়ে বিবদমান দু'পক্ষের কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী ও বিবাদীর মাঝে বিচারক যে মীমাংসা করে দেন তা আইনী সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিচিত। ফাত্ওয়ার ক্ষেত্রে তা মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশ্নকর্তার উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না; কিন্তু বিচারক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্ত বিবদমান উভয় পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য থাকে।[২৮] ফাত্ওয়া এবং ক্বাদ্বার পাথর্ক্য বর্ণনায় ইমাম ক্বারাফী (৬২৬-৬৮৪ হি.) বলেন:

> ক্বাদ্বা হচ্ছে দুনিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের বৈধতা কিংবা বাধ্যবাধকতার বিধানের সূচনা করে প্রদত্ত আইনী সিদ্ধান্ত, অপরদিকে ফাত্ওয়া হচ্ছে বিদ্যমান কোন বিধানের সন্ধানদাতা। ক্বাদ্বার ন্যায় ফাত্ওয়া কোন নতুন বিধান বা সিদ্ধান্ত সূচনা করে না; বরং বিদ্যমান কোন সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয় মাত্র।

ক্বাদ্বা ও ফাত্ওয়ার পাথর্ক্য সুস্পষ্ট করতে গিয়ে ইমাম ক্বারাফী আরো বলেন:

> আল্লাহর সাথে মুফতী এবং ক্বাদ্বীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ প্রধান বিচারপতির ন্যায় যে দু'জন লোক নিয়োগ দেয়, যেখানে একজন বিচারকার্যে তার প্রতিনিধি এবং আরেকজন তার দোভাষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যে বিচারকার্যে তার প্রতিনিধি সে স্বাধীনভাবে কোন বিধান দেয়া, বাধ্যবাধকতা আরোপ করা কিংবা রহিত করা ইত্যাদি করতে পারবে। কিন্তু যে তার দোভাষী তাকে অবশ্যই বিচারপতির প্রতিটি কথা কম-বেশী করা ব্যতীত হুবহু প্রকাশ করতে হবে। সুতরাং মুফতী হচ্ছেন আল্লাহর দোভাষী, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিদ্যমান বিধানের সন্ধানদানকারী মাত্র। অপরদিকে বিচারক আল্লাহর

---

২৭. মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *উসূল আল-ইফতা ওয়া আদাবুহু*, ঢাকা : মাকতাবাত শাইখুল ইসলাম, ২০১২, পৃ. ১২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

পক্ষ থেকে স্বীয় চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন বিধানের সূচনা, বাধ্যবাধকতা আরোপ কিংবা রহিতকরণ ইত্যাদি করে থাকেন।[২৯]

নিম্নের সারণির মাধ্যমে ফাত্ওয়া এবং আইনী সিদ্ধান্তের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে :

	ফাত্ওয়া	(ক্বাদা) আইনী সিদ্ধান্ত
এক:	সাধারণত ফাত্ওয়া মুফতীসহ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মুফতী সাধারণত সকলের জন্য প্রযোজ্য এমনিভাবে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন। যেমন: কেউ যদি এ রূপ করে এ রূপ হবে, ইত্যাদি।	নির্দিষ্ট কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত আইনী সিদ্ধান্ত হচ্ছে ক্বাদা, যা সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।
দুই:	প্রশ্নকারীর সমস্যা শুনার পর মুফতী নিজেই আইনের উৎসগুলোতে অনুসন্ধান ও গবেষণা করে সমাধান দিয়ে থাকেন।	সাধারণত বাদী-বিবাদীর পেশকৃত যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণাদির আলোকে বিচারক ফায়সালা করে থাকেন।
তিন:	শুধুমাত্র মুখের কথা নয়; বরং লিখা, ইশারা-ইঙ্গিত ইত্যাদির মাধ্যমেও ফাত্ওয়া দেয়া যেতে পারে।	শুধুমাত্র মুখের কথার মাধ্যমে বিচারকার্য হয়ে থাকে।
চার:	ফাত্ওয়া অনেক বেশী সংবেদনশীল; কারণ এটি সর্বজনীন বিধান, যা প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সকলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।	ক্বাদার সংবেদনশীলতা স্বল্প; কারণ বাদী-বিবাদী ব্যতিরেকে অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্বাদা প্রযোজ্য হয় না।
পাঁচ:	ইবাদাত, যাবতীয় লেন-দেন, শিষ্টাচার, চারিত্রিক বিষয়াবলি ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া প্রযোজ্য।	বিচারকার্য সাধারণত *মু'আমালাত* তথা লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে হয়ে থাকে।
ছয়:	কোন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান বর্ণনাই হচ্ছে ফাত্ওয়ার মূল উদ্দেশ্য। তাই ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হারাম, মাকরূহ কিংবা মুবাহ্ সকল ক্ষেত্রেই ফাত্ওয়া প্রযোজ্য হতে পারে।	ওয়াজিব, হারাম এবং মুবাহ্ এ তিনটি ক্ষেত্রে ক্বাদা প্রযোজ্য; মাকরূহ কিংবা মুস্তাহাব বিষয়াবলিতে ক্বাদা প্রযোজ্য নয়। কারণ ক্বাদা বল প্রয়োগ উপযোগী, কিন্তু মাকরূহ কিংবা মুস্ত াহাব বল প্রয়োগ উপযোগী নয়।
সাত:	ফাত্ওয়া দেয়ার জন্য এর কোনটিই শর্ত নয়, যতক্ষণ না তাদের লিখা কিংবা ইশারা বোধগম্য হয়।	সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হচ্ছে, বিচারকের জন্য স্বাধীন, পুরুষ, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাকশক্তির অধিকারী হওয়া শর্ত।

---

২৯. ইমাম আহমাদ ইবনে ইদ্রীস আল-ক্বারাফী, *আল-ইহকাম ফি তাময়ীয আল-ফাতাওয়া আনিল আহকাম ওয়া তাসাররুফাত আল-ক্বাদী ওয়া আল-ইমাম*, তাহকীক : আবদুল ফাত্তাহ আবু-গুদ্দাহ, হালাব : মাকতাবাত আল-মাতবুআত আল-ইসলামিয়াহ, ১৩৮৭ হিজরী, পৃ. ২০; সুলাইমান আবদুল্লাহ আল-আশক্বার, *আল-ফুতইয়া ওয়া মানাহিজুল ইফতা*, কুয়েত : মাকতাবাত আল-মানার আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৭৬, পৃ. ১০-১১

আট:	মুফতীর জন্য এ ধরনের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।	দৈনন্দিন রুটিন কিংবা একান্ত আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে অন্য কারো থেকে উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা বিচারকের জন্য বৈধ হবে না।
নয়:	ফাত্‌ওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো আবশ্যিক নয়।	বিচারকার্য সমাধা করার জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট প্রসেস ও প্রটোকল যেমন: পাহারাদার, লিখক ইত্যাদি আবশ্যক।
দশ:	ফাত্‌ওয়া ইসলামের বিধান বর্ণনাকারী; কিন্তু তা মেনে নিতে বল প্রয়োগ উপযোগী নয়।	ক্বাদা বল প্রয়োগ উপযোগী, অর্থাৎ: বাদী-বিবাদী উভয়ই সংশ্লিষ্ট আইনী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

সারণি ০১: ফাত্‌ওয়া এবং (*ক্বাদা*) আইনী সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য [৩০]

৪. ফাত্‌ওয়া প্রদানের গুরুত্ব এবং এ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন

ফাত্‌ওয়া প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ, সম্মানজনক কিন্তু সংবেদনশীল দায়িত্ব। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন:

> اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه في معرض للخطر، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله سبحانه وتعالى
>
> ফাত্‌ওয়া প্রদান অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ, বিপজ্জনক একটি দায়িত্ব। মুফতীগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। তারা সকলের পক্ষ থেকে ফাত্‌ওয়া প্রদানের গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন, যা সামগ্রিকভাবে (ফরযে কিফায়া) পুরো জাতির উপর আবশ্যিক। কিন্তু এটি বিপজ্জনকও বটে। তাই বলা হয়ে থাকে: মুফতীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে থাকেন।[৩১]

ইমাম শাতিবী (৫৩৮-৫৯০ হি.) বলেন:

> শরীয়াতের বিধান প্রচার-প্রসার, মানুষকে শরীয়াত শিক্ষা প্রদান, চিন্তা-গবেষণা ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন বিষয়ে শরীয়াতের বিধান উদ্ভাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুফতীগণ নবী-রাসূলদের স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁদের অনুসরণ এবং তাঁদের প্রদত্ত বিধানকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক।[৩২]

মুফতীগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী হিসেবে বিবেচিত করে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) তাঁর একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন *"ই'লাম আল-*

---

৩০. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন : মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, *দাওয়াবিত আল-ফাতওয়া ফি আশ্‌-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাত নাজাজ মুসতাফা আল-বায, ২০০৭, পৃ. ২৭-৩৫

৩১. ইমাম মুহীউদ্দিন আন্‌-নববী, *আল-মাজমু' শরহে আল-মুহায্‌যাব*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০১০, খ. ১, পৃ. ১৬৬

৩২. আশ-শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৮

মুওয়াক্‌কি'য়ীন 'আন রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীদের পথ নির্দেশিকা। সাধারণত যারা রাজা-বাদশাহদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, মানুষের নিকট তাদের মান-মর্যাদা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তাদের মান-মর্যাদা কিরূপ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।[৩৩] ফাত্ওয়া প্রদানের এ গুরুত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে মুফতীদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। এটা কোন নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে, আবেগের পরিপূর্ণ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের স্থান নয়; বরং এটা জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাহদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। তাই ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতীদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই তো যুগ পরিক্রমায় দেখা যায়, অনেক বড় বড় স্কলারও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং যথাসম্ভব ফাত্ওয়া প্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। ইবনু আবদিল বার্ উকবা ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন: আমি ইবনু উমরের সাথে ৩৪ মাস ছিলাম, অধিকাংশ সময়ে যখনি তাঁকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হত তিনি বলতেন: আমি জানি না। এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলতেন:

> تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم
>
> তুমি কি জান, এরা কী চায়? এরা আমাদের পিঠকে সেতু বানিয়ে জাহান্নাম পাড়ি দিতে চায়।[৩৪]

আল-খাতীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি.) বলেন: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামও অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ অবগত ও নিশ্চিত না হয়ে তাঁরা কোন ফাত্ওয়া দিতেন না। তারা সর্বদা চাইতেন তাঁদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন ফাত্ওয়া দিয়ে দেয়।[৩৫] বারা ইবনু আযিব রা. বলেন: "আমি তিনশত বদরী সাহাবীকে দেখেছি যাদের সবাই চাইতেন তাদের অপরজন যেন ফাত্ওয়া প্রদানের কাজটি সমাধা করে দেয়।"[৩৬] ইমাম শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি.) বলেন: "আমি যাদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে ইবনু উয়াইনাহ অন্যতম, যাঁকে আল্লাহ ফাত্ওয়া প্রদানের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দিয়েছেন; তথাপিও তিনি

---

৩৩. ইউসুফ আল-কারজাভী, *আল-ফাতওয়া বাইনা আল-ইনদিবাত ওয়াত তাসাইউব*, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৯৯৫, পৃ. ১৬

৩৪. ইবনু 'আবদিল বার্, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলিহি*, রিয়াদ : দারু ইবনি হাযম, ২০০৩, খ. ২, পৃ. ১১৯

৩৫. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, রিয়াদ : দার ইবনুল জাওযী, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ৩৪৯

৩৬. প্রাগুক্ত

ফাত্ওয়া প্রদান থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখতেন।"[৩৭] সুফ্ইয়ান ইবনে উয়াইনাহ (১০৭-১৯৮ হি.) বলেন: "মূলত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে, আর মূর্খ সে যে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বেশী বাকপটু হয়।"[৩৮] ইমাম শা'বীকে (১৬-১০৪/১০৬ হি.) কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: 'আমি জানি না'। তখন তাকে বলা হলো 'আমি জানি না' এ কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না অথচ তুমি হলে ইরাকের প্রসিদ্ধ ফকীহ? তিনি বললেন: কিন্তু ফেরেশতাগণও এ কথা বলতে লজ্জা করেনি যখন তারা বলেছিল: "হে আল্লাহ্ আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতিরেকে আমরা আর কিছুই জানি না"।[৩৯] আবু না'ঈম বলেন: "আমি ইমাম মালিকের রহ. (৯৩-১৭৯ হি.) মত কাউকে দেখিনি, যে কোন প্রশ্নের উত্তরে এত বেশী পরিমাণে 'আমি জানি না' বলে থাকে।"[৪০] আবু যাইয়াল বলেন: "তুমি যদি বলো আমি জানি না তাহলে তারা তোমাকে শিখিয়ে দেবে যাতে তুমি জানতে পার, আর যদি বলো আমি জানি তাহলে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, যদিও তুমি না জেনে থাক।"[৪১] ইমাম শাফিয়ীকে রহ. একদা কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি চুপ থাকলেন। তখন তাকে বলা হলো তুমি উত্তর দিচ্ছো না কেন? তিনি বললেন:

حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب

> যতক্ষণ না আমি জানতে পারব, চুপ থাকা কিংবা উত্তর দেয়ার মধ্যে কোনটা উত্তম হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চুপ থাকব।[৪২]

এছাড়াও কোন বিষয়ে না জেনে ফাত্ওয়া প্রদান করাকে স্কলারগণ মারাত্মক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রাসূলের স. একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا ، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

> আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানকে মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবেন না; বরং জ্ঞানীদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তিনি জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। সুতরাং যখন

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হামদান আল-হাররানী, *সিফাত আল-ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯৭ হিজরী, পৃ. ৯। এখানে কুরআন কারীমের সূরা আল-বাক্বারাহ'র ৩২ নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

৪০. ইমাম আহমাদ ইবনে হামদান আল-হাররানী, প্রাগুক্ত

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. ইমাম আন-নববী, *আদাবুল ফাতওয়া*, দিমাশক : দারুল ফিকর, ১৪০৮ হি. পৃ. ১৫

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে তাদের নেতা বানিয়ে নিবে, মানুষ তাদের থেকে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইবে, এবং তারা না জেনে এ সকল বিষয়ে ফাত্ওয়া দিবে। পরিণামে তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৪৩]

এছাড়াও আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَت فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ

যাকে কোনো ভুল ফাতওয়া দেওয়া হলো, তার পরিণাম ফাত্ওয়া দানকারীকেই ভোগ করতে হবে।[৪৪]

মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইমাম আবু হানীফার রহ. (৮০-১৫০ হি.) মতামত হচ্ছে, অবুঝ ব্যক্তির লেনদেনের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। কিন্তু যে মুফতী না জেনে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকে তার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার মতামত হচ্ছে, তার কার্যক্রম ও লেনদেনের উপর আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে; কারণ সে আল্লাহর বিধান নিয়ে খেল-তামাশা করে, যার পরিণাম পুরো জাতিকেই ভোগ করতে হয়। তাই তার ব্যক্তিগত কার্যক্রমের স্বাধীনতা সামগ্রিক ক্ষতির সমকক্ষ হতে পারে না।[৪৫]

৫. মুফতী হওয়ার শর্তাবলি

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের বিধান প্রচার-প্রসারে মুফতীগণ হচ্ছেন নবী-রাসূলের স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীতুল্য। মর্যাদাবান এ রকম একটি দায়িত্ব পালনের জন্য অবশ্যই তাদেরকে সার্বিকভাবে যোগ্য হতে হবে। ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য ইসলামের বিধি-বিধানের পর্যাপ্ত জ্ঞান, কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান, ইসলামী আইনের দলিল-প্রমাণাদি অবগতি, আরবী ভাষায় দক্ষতা, ইসলামী আইনে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্যতা, নতুন সংঘটিত বিষয়ে সমাধান প্রদানে সক্ষমতা, সর্বোপরি জন-জীবন সর্ম্পকে বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ নানাবিধ বিষয়ে যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ইমাম নববী বলেন:

شرط المفتي كونه مكلفا مسلما، وثقة مأمونا، متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته

---

৪৩. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ইলম, অনুচ্ছেদ : কাইফা ইউকবাদ আল-ইলম, বৈরূত : দার ইবনে কাছীর, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৫০, হাদীস নং ১০০

৪৪. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আবু আবদুল্লাহ আল-কাযওয়ীনী, *সূনান ইবনে মাযাহ*, অনুচ্ছেদ : ইজতিনাব আর-রায়ি' ওয়াল ক্বিয়াস, দিল্লী, ১৯০৫, খ. ১, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ৫৫; শাইখ আলবানী হাদীসটি হাসান বলে মূল্যায়ন করেছেন

৪৫. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

মুফতী হওয়ার শর্ত হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, পাপাচার ও চারিত্রিক মাধুর্য নষ্ট করে এমন বিষয় থেকে মুক্ত, বুদ্ধিমান, সুস্থ মন-মানসিকতার অধিকারী, সঠিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, লেনদেনে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী এবং সচেতন হওয়া। এ ক্ষেত্রে পুরুষ, নারী, দাস, স্বাধীন, অন্ধ কিংবা বোবা সবাই সমান, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের লিখা কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত বোধগম্য হয়।[৪৬]

ইবনে হাজার আল-হাইতামীর (৯০৯-৯৭৩ হি.) উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু আবিদীন (১১৯৮-১২৫২হি.) বলেন:

لا يجوز الإفتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى أساتذة مهرة، وإنما طالع الكتب الفقهية بنفسه، وإن الكتب الفقهية لها أسلوب يخصها، فربما يذكر الفقهاء كلاما مطلقا ويقصدون شيئا مقيدا، اعتمادا على ذكر تلك القيود في مواضع أخرى، أو على فهم السامع

যে ব্যক্তি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করেনি; বরং ফিক্‌হী বই-পুস্তক নিজে নিজে অধ্যয়ন করেছে, ফাত্‌ওয়া প্রদান করা তার জন্য বৈধ হবে না। ফিক্‌হী গ্রন্থগুলোর প্রণয়ন এবং অধ্যয়নের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, কোন স্থানে লেখক একটি সাধারণ শব্দ উল্লেখ করে এর মাধ্যমে বিশেষ কোন শর্ত বা অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা তিনি তার গ্রন্থের অপর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উপরন্তু এটা পাঠক কিংবা শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং নিজে নিজে অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নাও বুঝা যেতে পারে, কিন্তু কোন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়নকালে তিনি অবশ্যই এ ধরনের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেবেন, যার ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।[৪৭] এ ক্ষেত্রে অপর একটি শর্ত হচ্ছে:

لا يجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدى الأساتذة، حتى تحصل له ملكة يعرف بها أصول الأحكام، وقواعدها، وعللها، ويميز الكتب المعتبرة عن غيرها

এমনিভাবে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শিক্ষকদের নিকট ফিক্‌হী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু ফিক্‌হের মূলনীতি, গবেষণা বা বিধান উদ্ভাবন করার নিয়ম-নীতি, বিদ্যমান বিধি-বিধানের অভ্যন্তরীণ কারণ ও হিকমত ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেনি এবং ফিক্‌হী গ্রন্থগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা মূল্যায়ন করার যোগ্যতা অর্জন করেনি, সেও ফাত্‌ওয়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।[৪৮]

---

৪৬. ইমাম আন্‌-নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১, পৃ. ১৬৮

৪৭. ইবনে আবেদিন, রাসমুল মুফতী, *মাজমূআত রাসায়েল ইবনে আবেদিন*, আলম আল-কুতুব, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৬; মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪৮. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আর-রাশেদী, *আল-মিসবাহ ফি রাসমিল মুফতী ওয়া মানাহিজ আল-ইফতা*, বৈরূত : দারু ইহয়া আত-তুরাছ আল-আরবী, ২০০৫, পৃ. ২৮৬

নিম্নে মুফতী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি আলোচনা করা হল:

মৌলিক শর্তাবলি[৪৯]

এক: কুরআন-কারীমের জ্ঞান: কুরআন কারীম হচ্ছে ইসলামের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

হে নবী! আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যা হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।[৫০]

সুতরাং আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সকল বিধি-বিধান, এ সকল বিধি-বিধানের উদ্ভাবনী নীতিমালা, এগুলোর অন্তর্নিহিত হিকমাত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে মুফতীর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এছাড়াও কুরআন বুঝার জন্য যে সকল জ্ঞানের প্রয়োজন হয় যেমন: নাসিখ[৫১] ও মানসুখ,[৫২] আয়াত নাযিলের উপলক্ষ ও প্রেক্ষাপট, কুরআনের শব্দাবলির অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্দি করার বিভিন্ন নীতিমালা তথা আম,[৫৩] খাস,[৫৪] মানতুক,[৫৫] মাফহুম,[৫৬] মুজমাল,[৫৭] মুফাচ্ছার,[৫৮] নাস,[৫৯]

---

৪৯. মুহসিন সালিহ আদ-দূসকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯

৫১. পরবর্তীতে নাযিলকৃত বিধান যা পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করে দেয়। কুতুব মুস্তফা সানু, *মু'জাম মুসতালাহাত উসূল ফিক্হ*, দামেস্ক : দারুল ফিক্র, ২০০০, পৃ. ৪৫৭

৫২. পরবর্তীতে নাযিলকৃত দলীলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী যে বিধানটি রহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে মানসূখ। কুতুব মুস্তফা সানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

৫৩. সাধারণ অর্থবোধক শব্দ, যা গঠনগত দিক থেকে তদসংশ্লিষ্ট সকল কিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে থাকে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

৫৪. বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, যা গঠনগত দিক থেকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, যেমন : খালিদ, আলী, বা নির্দিষ্ট কোন জাতি, যেমন : মানুষ, সিংহ, বা সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যেমন : 'আদ সম্প্রদায়, ছামূদ জাতি, ইত্যাদি বুঝায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৫৫. কোন শব্দ থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২

৫৬. শব্দের অস্পষ্ট ও পরোক্ষ অর্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

৫৭. যে শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ অস্পষ্ট, এবং যা বুঝার জন্য দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৫৮. যে শব্দের অর্থ এবং প্রয়োগ সুস্পষ্ট, এবং যেখানে দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা করা (তাওয়ীল), কিংবা কোন কিছুর সাথে শব্দকে নির্দিষ্ট করার (তাখসীস) কোন অবকাশ নেই। রাসূলের স. তিরোধানের পর সকল মুফাচ্ছার শব্দগুলো মুহকাম হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ এগুলো এখন আর রহিত হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৫

৫৯. কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়, এবং উক্ত শব্দ যদি সুস্পষ্টভাবে সে বিশেষ অর্থের প্রতি দিকনির্দেশ করে তাহলে তা হচ্ছে নাস। তবে উক্ত অর্থ তাওয়ীল এবং তাখসীস এর সম্ভাবনা রাখে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

যাহির,[৬০] সরীহ,[৬১] কিনায়া,[৬২] অলংকারশাস্ত্র তথা মা'য়ানী ও বায়ান ইত্যাদি; ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য এ সকল বিষয়ের জ্ঞানও অতীব জরুরী।

দুই: হাদীসের জ্ঞান : কুরআন কারীমের পর ইসলামী আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হচ্ছে রাসূলের স. হাদীস। হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা এবং বাস্তবরূপ। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদীসের কোন বিকল্প নেই। তাই একজন মুফতীর অবশ্যই হাদীসের জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু হাদীস কুলহীন সাগরের ন্যায়, তাই সকল হাদীস না হলেও কমপক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসগুলো অবগত হতে হবে। উপরন্তু হাদীস সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় যেমন: হাদীসের সূত্র ও বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট, হাদীসের সীমাকাল তথা নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একজন মুফতীর দক্ষতা থাকা আবশ্যক।

তিন: ইজতিহাদ ও ক্বিয়াসের জ্ঞান : কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে মানব জীবনের সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের মৌলিক সমাধান দেয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির উপর ওহী অবতীর্ণ করার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দিয়েছেন। যেহেতু এখন ওহী আসার কোন সুযোগ নেই তাই বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দেয়ার প্রাক্কালে সরাসরি কুরআন-হাদীসে কোন সমাধান না পেয়ে একজন মুফতী হয়তো বিদ্যমান মূলনীতির আলোকে চিন্তা-গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য হবেন। তাই ফাত্ওয়া প্রদানকারীকে অবশ্যই চিন্তা-গবেষণা, কিয়াস তথা বিদ্যমান বিধানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সমাধান আবিস্কার ও ইজতিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। সে ক্ষেত্রে মুফতীকে অবশ্যই মূল বিধান এবং এর উৎস, কিয়াস করার নিয়ম-নীতি, বিদ্যমান বিধানের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে পূর্ববর্তী স্কলারগণের অনুসৃত পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়েও অবগত হতে হবে।

চার: সর্বজন স্বীকৃত এবং বিতর্কিত বিষয়াবলির জ্ঞান : যে সকল বিষয়াবলিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে পূর্ববর্তী স্কলারগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সে সকল বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখা আবশ্যক; কারণ অনেক ক্ষেত্রে সে সকল বিষয়ে নতুন কোন চিন্তা-গবেষণার অবকাশ থাকে না, এবং এ সকল বিষয়ে সর্বজন স্বীকৃত মতামতটিই প্রাধান্য পাবে। অপরদিকে কতিপয় বিষয় যেগুলো বিতর্কিত

---

৬০. কোন শব্দ শুনার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মস্তিষ্ক যে অর্থের দিকে ধাবিত হয় উক্ত শব্দটি সে অর্থের ক্ষেত্রে যাহির। তবে এ ক্ষেত্রে সমার্থবোধক কিংবা বিপরীত অন্য অর্থও বুঝানোর সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত শব্দকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না, এবং উক্ত অর্থ তাওয়ীল এবং তাখসীস এর সম্ভাবনা রাখে, প্রাগুক্ত, ২৭২

৬১. যে শব্দের অর্থ পুরোপুরি সুস্পষ্ট, প্রাগুক্ত, ২৫৬

৬২. যে শব্দের অর্থ অস্পষ্ট এবং যা বুঝার জন্য অপর একটি দলীল, কিংবা আকার-ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয়, প্রাগুক্ত, ৩৭০

বিষয় হিসেবে বিবেচিত এবং যেখানে একাধিক মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে, মুফতীকে অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্র ভেদে যে মত সর্বাধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করবে।

পাঁচ: আরবী ভাষার জ্ঞান : কুরআন, হাদীস থেকে শুরু করে ইসলামী বিধি-বিধানের মৌলিক সকল উৎস আরবী ভাষায় প্রণীত। তাই সঠিক ফাত্ওয়া প্রদানের নিমিত্তে একজন মুফতীর আরবী ভাষার উপর দখল থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আরবী ভাষার পণ্ডিত না হলেও, কমপক্ষে আরবী ভাষার স্টাইল, সম্বোধন, অর্থ উদ্ভাবন, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ছয়: সমাজ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান : যিনি ফাত্ওয়া দিবেন তাকে অবশ্যই তার চতুর্দিকে বসবাসরত সমাজের মানুষের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে হবে। মুফতী যদি এক জগতে থাকেন, আর সমাজের মানুষ অপর এক জগতে থাকে তাহলে তার ফাত্ওয়া যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম; কারণ সে ক্ষেত্রে যা বাস্তবে হচ্ছে তা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র যা হওয়া উচিত তার মধ্যেই মুফতীর চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ থাকবে, অথচ যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে হচ্ছে দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন: ফকীহ হচ্ছেন তিনি, যিনি যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে হচ্ছে দু'টোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।[৬৩]

সাধারণ শর্তাবলি[৬৪]

এক: মুসলমান হওয়া: যেহেতু ফাত্ওয়া হচ্ছে কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের স. পক্ষ থেকে সমাধান বা মতামত প্রদান করা, তাই এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, ফাত্ওয়া প্রদানকারীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

দুই: প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া: অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। যে কোন কাজের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে এ দু'টি সাধারণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত।

তিন: পুরুষ বা স্বাধীন হওয়া শর্ত নয়: উল্লেখ্য যে, ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষ বা স্বাধীন হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাই পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা দাস, যে কেউ উপরে বর্ণিত যোগ্যতা সাপেক্ষে ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ইবনুস সালাহ্ বলেন: মুফতী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং পুরুষ হওয়া শর্ত নয়।[৬৫]

---

৬৩. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৬৪. মুহসিন সালিহ্ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৬৫. ইবন আস্-সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, মদীনা মুনাওয়ারাহ : মাকতাবাত আল-উলূম ওয়াল হিকাম, ২০০২, পৃ. ৫৬

চারিত্রিক শর্তাবলি: [৬৬]

এক: মুত্তাকী ও ন্যায়বিচারক হওয়া: মুফতীর মধ্যে অবশ্যই তাকওয়া ও সুবিচার করার গুণাগুণ থাকতে হবে। শুধুমাত্র শরীয়াতের জ্ঞান থাকাই বড় কথা নয়; বরং সে জ্ঞান অনুযায়ী সর্বাগ্রে নিজেকে কাজ করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহভীতি, একনিষ্ঠতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদি গুণাবলি আয়ত্ত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে।[৬৭]

আলী (২৩ হি.পূর্ব-৪০ হি.) রা. বলেন:

ফকীহ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, কোন অপরাধমূলক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা অনুসন্ধান করে না। যে জ্ঞানের মধ্যে ফিক্‌হের জ্ঞান নেই সেখানে সত্যিকার কোন কল্যাণ নেই, আবার যে ফিক্‌হতে তাকওয়া, গবেষণা, অনুসন্ধান নেই সেখানে সত্যিকার কল্যাণ নেই।[৬৮]

হাসান বসরী (২১-১১০ হি.) র. বলেন:

সত্যিকারের ফকীহ হচ্ছে সে যে মুত্তাকী, আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং দুনিয়ার সম্পদ থেকে লোভমুক্ত। যে তার থেকে নিম্নপর্যায়ের কোন ব্যক্তিকে উপহাস করে না, উচ্চ পর্যায়ের কোন ব্যক্তির প্রতি লালায়িত হয় না এবং সর্বোপরি পার্থিব কোন সম্পদ অর্জনের জন্য জ্ঞান অর্জন করে না।[৬৯]

দুই: ভুল থেকে প্রত্যাবর্তন করা: একজন ফকীহর চারিত্রিক মাধুর্যের আরেকটি অন্যতম দিক হচ্ছে, যখনি সে কোন বিষয়ে ভুলের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে সাথে সাথে তা থেকে ফিরে এসে বিশুদ্ধ মতটি গ্রহণ করবে এবং ভুলের উপর বহাল থাকবে না। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য তার কোন গুনাহ হবে না; বরং চিন্তা-গবেষণা করার জন্য সে একটি প্রতিদান পাবে। আর যদি তা বিশুদ্ধ হয় তাহলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

বিচারক যদি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় এবং তা সঠিক হয় তাহলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে, আর যদি ভুল হয় একটি প্রতিদান পাবে।[৭০]

---

৬৬. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
৬৭. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৮
৬৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৬৯. প্রাগুক্ত
৭০. ইমাম আত্‌-তিরমিযী, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : মা জা'আ ফিল ক্বাদী ইউসিবু ওয়া ইউখতিয়ু, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৯৮, খ. ৫, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং ১৩৭৬; হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও ভিন্নশব্দে রয়েছে।

তিনঃ যা সঠিক তা অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া দেয়াঃ নিজের জ্ঞানানুযায়ী চিন্তা-গবেষণা করার পরে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, যা সঠিক বলে মনে হবে, ফকীহকে অবশ্যই সে অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবৈধ কোন চাপ কিংবা হস্তক্ষেপের কারণে নিজের মতামত পরিবর্তন করা ফকীহর জন্য বৈধ হবে না। ইতিহাস পরিক্রমায় আমরা দেখি, ইমাম আবু হানীফা, ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.), আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) প্রমুখ স্কলারগণ অনেক জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু তবুও তারা তাদের দেয়া ফাত্‌ওয়া পরিবর্তন করেননি।
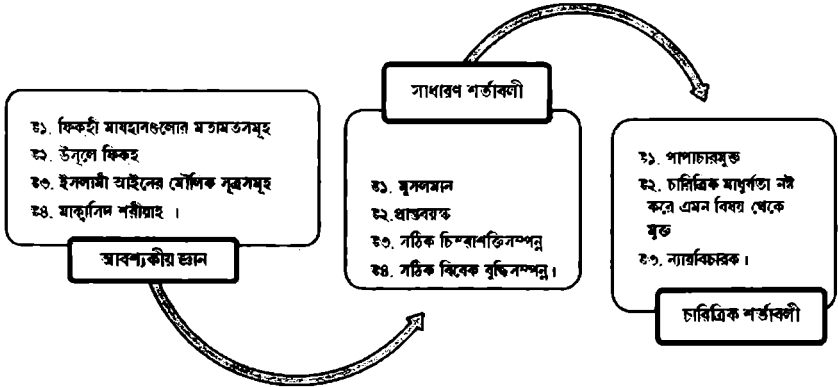
চিত্র ০১ঃ মুফতী হওয়ার শর্তাবলী[৭১]

আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমী ওআইসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১৫৩ (২/১৭) মুফতী হওয়ার জন্য যে সকল শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক. কুরআন, সুন্নাহ এবং তদ্বসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির জ্ঞান থাকা;

খ. স্কলারদের সর্বসম্মত ও বিতর্কিত মতামতগুলো জানা এবং ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাব ও ফিক্‌হী মতামতগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা;

গ. উসূলে ফিক্‌হ, কাওয়ায়িদ ফিক্‌হ এবং মাক্বাসিদ শরীয়াহ তথা ইসলামী আইনের গবেষণার মূলনীতি, ইসলামী আইনের মৌলিক সূত্রসমূহ, ইসলামী আইনের মহৎ উদ্দেশ্যাবলি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ দখল থাকা। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমনঃ আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক;

---

৭১. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। শর্তবালী বিস্তারিত জানতে আরো দেখুন : আবদুল আজীজ ইবনে রাবী'আ, *আল-মুফতী ফী আশ্-শরীয়াহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া তাতবীকাতুহু ফি হাযা আল-'আসর*, রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ২০-২৮; সুলাইমান আবদুল্লাহ আল-আশক্বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

ঘ. সমাজের মানুষের অবস্থা, কৃষ্টি-কালচার, সময়ের আবর্তনে ঘটিত নতুন ঘটনাবলি, চতুর্দিকে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, উত্থান-পতন, ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকা;

ঙ. ইসলামী আইনের মৌলিক উৎসসমূহ থেকে গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের জন্য আইন ও সমাধান বের করার যোগ্যতা থাকা;

চ. সর্বোপরি কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কুশলীদের মতামত সংগ্রহ করা, যেমনঃ ডাক্তারী বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং অর্থনীতির বিষয়ে অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের সাথে পরামর্শ করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা আবশ্যক।[৭২]

৬. ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা [৭৩]

উপরে আলোচনা করা হয়েছে, ফাত্ওয়া মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংবেদনশীল একটি বিষয়। সঠিক নিয়মে প্রদত্ত ফাত্ওয়া যেমনিভাবে মানব সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনিভাবে সঠিক নিয়ম-নীতি বহির্ভূত ফাত্ওয়া মানব সমাজের অকল্যাণ ও ক্ষতি বয়ে আনতে বাধ্য। তাই ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ আবশ্যক। নিম্নে ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় এবং পালনীয় কতিপয় নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছেঃ

এক: ফাত্ওয়া প্রদানকারী উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য মুফতী হতে হবে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি ফাত্ওয়া দেয়, তাহলে সে গুণাহগার হবে।[৭৪] কুরআন-কারীমে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র জ্ঞানীদের থেকে কোন বিষয়ে জানতে চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

অতএব তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[৭৫]

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾

---

৭২. ইসলামী ফিক্হ একাডেমী ওআইসি, ক্বারারাত ও তাওসীয়াত, *মাজাল্লাত আশ-শরীয়াহ ওয়াল কানুন*, ২০০৬, খ. ২৭, পৃ. ৫৪৯

৭৩. মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮৫; ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১৩৫; আবদুল আজীজ ইবনে রাবী'আ, প্রাগুক্ত, ২৯-৫২

৭৪. ইবনুল কাইয়িম, *ইলাম আল-মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৪, খ. ৪. পৃ. ৪৫৮

৭৫. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩

তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা কখনো সফলকাম হবে না।[৭৬]

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بنيانه في جهنم و من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه و من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.

যে ব্যক্তি আমি বলি নাই এমন কথা আমার পক্ষ থেকে বলে সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল; যে ব্যক্তি না জেনে কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয় এর গুনাহ তার উপর বর্তাবে, প্রশ্নকারীর উপর নয়; যে ব্যক্তি সঠিক নয় জেনেও কাউকে সে বিষয়ে ইতিবাচক পরামর্শ দেয়, সে যেন তার খেয়ানত করল।[৭৭]

দুই: শরীয়াতের মৌলিক ও সুস্পষ্ট কোন দলীল-প্রমাণ, কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস ইত্যাদির সাথে ফাত্ওয়া সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। এমনটি হলে এ ধরনের ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না।

তিন: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কোন মাযহাব বা নির্দিষ্ট কোন মতামতের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। মুফতী নিজে কোন নির্দিষ্ট মতামত অনুসরণ করলেও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে মতটি প্রশ্নকর্তার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মাযহাবই সঠিক এবং এর মধ্যে যে সিদ্ধান্তটি প্রশ্নকারীর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বলে মনে হবে, সে মতানুযায়ী ফাত্ওয়া দিতে হবে।[৭৮] ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: মুফতীর উচিত যে মতামতটি সঠিক বলে মনে হবে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দেয়া, যদিও তা স্বীয় মাযহাবের বিপরীত হয়।[৭৯]

---

৭৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৬

৭৭. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নীসাবুরী, *আল-মুসতাদ্রাক আলা-আস্-সাহীহাইন*, অধ্যায় : ইলম, অনুচ্ছেদ : মান কালা আলাইয়া মা লাম আকুল, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ৩৫০

৭৮. আবদুল মাজীদ মুহাম্মদ আস্-সূসূহ, দাওয়াবিতুল ফাতওয়া ফিল ক্বাদায়া আল-মু'আসারাহ, *মাজাল্লাত শরীয়াহ ওয়া দিরাসাত ইসলামিয়াহ*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, খ. ৬২, পৃ. ২২৩; শাহ ওয়ালীউল্যাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহি আল-বালিগাহ*, বৈরূত : দারুল জীল, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ২৬৪

৭৯. ইবনুল কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৮
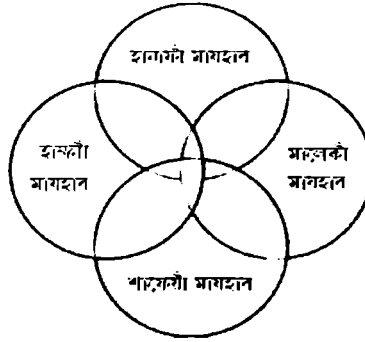
চিত্র ০২: মাযহাবসমূহ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক নয়[৮০]

তবে উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে তালফীক করা যাবে না। তালফীক হচ্ছে কোন একটি বিষয়ের আংশিক কোন কিছুতে সকল মাযহাবের সংমিশ্রণে নিজের সুবিধামত এমন মতামত তৈরী করা, যাতে কোন স্কলার কিংবা কোন মাযহাবের সমর্থন নেই। নিচের সারণির মাধ্যমে তালফীক এর ধারণা আরো সুস্পষ্ট হবে।

বিষয়: মুসলিম বিবাহে অভিভাবক কিংবা সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা			
	হানাফী মাযহাব	মালিকী মাযহাব	শাফিয়ী মাযহাব
অভিভাবক	আবশ্যক নয়	আবশ্যক	আবশ্যক
সাক্ষী	আবশ্যক	আবশ্যক নয়	আবশ্যক

সারণি ০২: তালফীক এর সচিত্র বিশ্লেষণ[৮১]

এখন কেউ যদি অভিভাবকের ক্ষেত্রে হানাফী মতামত এবং সাক্ষীর ক্ষেত্রে মালিকী মতামত গ্রহণপূর্বক ফাত্ওয়া দেয় যে, মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবক কিংবা সাক্ষী কোনটিই আবশ্যক নয়, এটাই হবে তালফীক এবং এটা বৈধ নয়; কারণ ইতঃপূর্বে কোন স্কলার কিংবা কোন মাযহাব এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করে নি।

চার: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে যে মতটি পালন করা প্রশ্নকর্তার জন্য সহজ ও সাবলীল হবে সে মতটিই গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সহজ মতটিই গ্রহণ করা উত্তম। যদিও মুফতী ইচ্ছে করলে নিজের জন্য কঠিন মতটি বেছে

---

৮০. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। দেখুন : মুহাম্মদ ইবনে আলাওয়ী, *শরীয়াত আল্লাহি আল-খালিদাহ, দিরাসাহ ফি তারিখ তাশরী' আল-আহকাম ওয়া মাযাহিব আল-ফুক্বাহা আল-আ'লাম*, মদীনা মুনাওয়ারাহ, মাতাবি' আল-রাশীদ, ১৯৯২, পৃ. ৩৪৪; মুসতাফা আহমদ আয্-যারক্বা, *আল-ফিক্হ আল-ইসলামী ফি সাওবিহি আল-জাদীদ, আল-মাদখাল আল-ফিক্হী আল-'আম*, দামেস্ক : দারুল ক্বালাম, ১৯৯৮, খ. ১, পৃ. ২৫৯

৮১. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। দেখুন : সা'আদ আল-আনাযী, আত্-তালফীক ফিল ফাতওয়া, *মাজাল্লাত শরীয়াহ ওয়া দিরাসাত ইসলামিয়াহ*, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, খ. ৩৮, পৃ. ২৬৯

নিতে পারেন, কিন্তু ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই প্রশ্নকর্তার জন্য যেটা উপযুক্ত এবং সহজ সেটি গ্রহণ করতে হবে। যে কোন বিষয়ে সহজ পথ অবলম্বন করা ইসলামের অন্যতম একটি মূলনীতি, যতক্ষণ না এর মাধ্যমে ইসলামী আইনের কোন সিদ্ধান্তের লঙ্ঘন হয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজটিই কামনা করেন, এবং তোমাদের জন্য কোন জটিলতা কামনা করেন না।[৮২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।[৮৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান; কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮৪]

আয়েশা রা. (মৃ. ৫৮ হি.) বলেন:

ما خير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه

রাসূলকে স. কে যখনি দু'টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হত, তিনি সর্বদা সহজটিই বেছে নিতেন, যতক্ষণ না তা পাপাচার হয়, আর যদি তা পাপাচার হয় তাহলে বিষয়টি থেকে তিনি সবার চেয়ে বেশী দূরে থাকতেন।[৮৫]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

তোমরা সহজ কর, কঠিন করিও না; সুসংবাদ দাও, দুঃসংবাদ দিও না।[৮৬]

অন্যত্র তিনি বলেন: إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে; কঠিন করার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি।[৮৭]

---

৮২. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

৮৩. আল-কুরআন, ৫ : ৬

৮৪. আল-কুরআন, ৪ : ২৮

৮৫. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : সিফাত আন্-নাবী স., বৈরুত : দার ইবনে কাছীর, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ১৩০৬, হাদীস নং-৩৩৬৭

৮৬. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মা কানা আন্-নাবী স., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮, হাদীস নং ৬৯

৮৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : আল-আরদ ইউসিবুহা আল-বাউল, বৈরূত : দারুল কিতাব আর-আরবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং ৩৮০

সুতরাং ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সহজটিই গ্রহণ করা উত্তম। ইমাম সুফ্য়ান আস-সাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন: "ফিক্হ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে সহজ পন্থা জেনে নেয়ার নাম; কাঠিন্য তো সবাই অপছন্দ করবে।"[৮৮] তাই স্কলারগণ বলে থাকেন: যদি কঠিন পন্থা গ্রহণ কর তাহলে তা নিজের ক্ষেত্রে কর, কিন্তু মানুষের জন্য সহজ এবং সাবলীল মতটিই বেছে নাও।
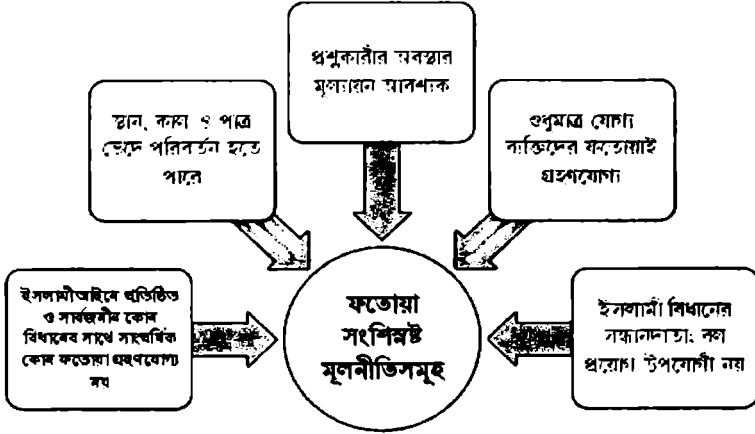
চিত্র ০৩: ফাত্ওয়া সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ [৮৯]

পাঁচ: ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করতে হবে। মানুষের কাছে বোধগম্য, মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

> আমি সকল নবীকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে।[৯০]

শুধুমাত্র শব্দ চয়ন নয়; বরং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি, যুক্তি উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সহজ ও সাবলীল হতে হবে। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারণ, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, প্রদত্ত বিধানের গুরুত্ব ও হিকমাত ইত্যাদিও উল্লেখ করতে হবে, যাতে প্রদত্ত ফাত্ওয়া মেনে নেয়া এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়।

---

৮৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৮৯. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ। উক্ত মূলনীতিগুলো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন : *আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্হীয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫, খ. ৩২, পৃ. ২১ ও ৩৮; তাক্বী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯ ও ২০২; ইবনুল কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫; এবং মুহসিন সালিহ আদ-দূসকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৯০. আল-কুরআন, ১৪ : ৪

ছয়: যে সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির ইহকালীন কিংবা পরকালীন কোন কল্যাণ নেই, সযত্নে তা এড়িয়ে যেতে হবে। যদি এ সকল বিষয়ে কোন প্রশ্ন আসে তাহলে ব্যক্তি বা সমাজের জন্য কল্যাণকর হয় এমনভাবে তার উত্তর দিতে হবে।

ইমাম আল-কারাফী বলেন: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর জন্য উপযুক্ত কিংবা প্রয়োজনীয় নয় এমন সকল বিষয়ে এড়িয়ে যেতে হবে। যেমন প্রশ্নকারী যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি হয়, আর এ ক্ষেত্রে সে যদি আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, রাসূলের ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয়াদি যেগুলো অভিজ্ঞ এবং বড় স্কলারদের আলোচনার বিষয়, সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাহলে এগুলোর উত্তর না দিয়ে তার জন্য দরকারী ইবাদাত কিংবা লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার যদি কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে তাহলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।[৯১]

যেমন খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীযকে (৬১-১০১ হি.) সিফ্ফীন যুদ্ধের লড়াই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "এ সকল রক্তপাত থেকে আল্লাহ তা'আলা আমার হাতকে হেফাজত করেছেন; তাই এ জাতীয় বিষয়ে আলোচনা করে আমি আমার জিহ্বাকে কলুষিত করতে চাই না।"[৯২]

ইবনুল কাইয়িম বলেন:

> অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর হয় এমনভাবে উত্তর দেয়া মুফতীর জন্য শুধু কেবল বৈধ নয়; বরং এটা মুফতীর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয়ও বটে।[৯৩]

সাত: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ-না, বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পথ পরিহার করে যথাসম্ভব বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অবলম্বন করতে হবে। যে বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়া হবে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপরও আলোকপাত করতে হবে, যাতে প্রশ্নকর্তা কিংবা পাঠক সহজেই বিষয়টি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন:

> ফাত্ওয়ার সৌন্দর্য হচ্ছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা এবং প্রয়োজনের নিরিখে দলিল-প্রমাণাদি সহকারে বিপরীতধর্মী মতামতগুলোও আলোচনা করতে হবে, যাতে প্রশ্নকারীর মনে যদি কোন সংশয় থাকে তা দূর হয়ে যায়।[৯৪]

ইবনুল কাইয়িম বলেন: কোন বিষয় যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবী রাখে সে ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবে ফাত্ওয়া দেয়া মুফতীর জন্য বৈধ হবে না।[৯৫]

---

৯১. আল-ক্বারাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২
৯২. আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৯৩. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১৪
৯৪. আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৯৫. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫

আট: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর সমাজ বা এলাকার কৃষ্টি-কালচার, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। ইসলামের মৌলিক কোন বিষয়ের লঙ্ঘন না করে যথা সম্ভব প্রশ্নকারীর সামাজিক রীতি-নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফাত্ওয়া দিতে হবে। ইমাম কারাফী বলেন: এই বিষয়টি অবশ্যই লক্ষণীয় এবং এতে কোন দ্বিমত নেই। যদি মুফতী এবং প্রশ্নকর্তার শহর কিংবা এলাকার সামাজিক রীতি-নীতি এক না হয়, তাহলে এর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত ফাত্ওয়া এক ও অভিন্ন হবে না।[৯৬]

নয়: ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্থান, কাল এবং পাত্র ভেদে ফাত্ওয়ার মধ্যে ভিন্নতা আসতে পারে। অনেক দিন পূর্বের প্রদত্ত ফাত্ওয়া এখন উপযোগী নাও থাকতে পারে। একই বিষয়ের ফাত্ওয়া দু'স্থানে কিংবা দু'ব্যক্তির জন্য একই নাও হতে পারে। বিশেষ করে যে সকল ফাত্ওয়ার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই; বরং ইজতিহাদ, জনজীবনের কল্যাণ, মাসলাহা কিংবা কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। জনকল্যাণ কিংবা কৃষ্টি-কালচারে পরিবর্তন আসলে এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত ফাত্ওয়াতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন: "ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ; অন্যথায় ভুল ফাত্ওয়া দেয়া কিংবা আল্লাহর শরীয়াতকে ভুল বুঝার মাধ্যমে মানুষ দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" তিনি আরো বলেন: "এটাই স্বাভাবিক যে স্থান, কাল, অবস্থা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ফাত্ওয়ার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ, উপকার, শান্তি-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করাই হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াতের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের সকল বিধি-বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, মানব কল্যাণ নিশ্চিত করা, মানব জীবন থেকে ক্ষতিকর বিষয়-বস্তুগুলো দূর করা ইত্যাদি। সুতরাং ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করা না হয়, তাহলে শরীয়াতের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।"[৯৭] ইসলামী আইনের একটি মৌলিক সূত্র হচ্ছে "এটাই স্বাভাবিক যে, সময়ের পরিবর্তনে হুকুম বা বিধানের মধ্যেও পরিবর্তন আসবে।"[৯৮]

---

৯৬. আল-ক্বারাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯; মুহসিন সালিহ আদ-দাসূকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৯৭. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫; ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৯৮. মৌলিক সূত্রটি হচ্ছে: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (It cannot be denied that changes in rulings follow changes in time) বিস্তারিত দেখুন : আযমান ইসমাঈল এবং মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*, কুয়ালালামপুর : ইসলামিক ব্যাংকিং এ- ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট অফ মালয়শিয়া, ২০১৩, পৃ. ১০৯

৭. ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সংঘটিত ভুল-ত্রুটি সমূহ[৯৯]

এক : শরীয়াতের মৌলিক দলীল সম্পর্কে উদাসীন হওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, শরীয়াতের কোন মৌলিক দলীল তথা কুরআন কিংবা হাদীস নির্ভর দলীল ব্যতিরেকে শুধুমাত্র চিন্তা-গবেষণাপ্রসূত কোন যুক্তি বা অন্য কারো মতামতের উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে হাদীসের উপর বেশী অবিচার করা হয়। অনেক সময় দুর্বল কিংবা বানোয়াট কোন কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়ে এর উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়।

দুই : অপব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, কুরআন কিংবা হাদীসের তথ্যসূত্র ঠিক থাকলেও এর ভুল ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়া হয়, যা ইতঃপূর্বে কোন স্কলার বলেননি কিংবা যা ইসলামের মৌলিক বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

তিন : অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবে যা ঘটেছে তার উপর ভিত্তি না করে উক্ত ঘটনাকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে তারপর পছন্দমত ফাত্ওয়া দেয়া হয়ে থাকে, যা ইসলামে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

চার : নিজের খেয়াল-খুশী মোতাবেক, অবস্থার চাপে কিংবা পার্থিব কোন কিছু লাভের আশায় ফাত্ওয়া দেয়া। ফাত্ওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে পূববর্তী যে কোন ফকীহদের মতামত গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে কোন মতটি বর্তমান সমস্যার জন্য উপযুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে যদি নিজের মন-মর্জি কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম হবে।[১০০]

ইমাম ক্বারাফী বলেন:

> কোন বিষয়ে যদি দু'টি মত থাকে, একটি কঠিন এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত সহজ, এ ক্ষেত্রে কেউ যদি সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন এবং বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সহজ মতটির উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেয়, তাহলে উক্ত ফাত্ওয়া গ্রহণযোগ্য হবে না, এবং এটি একটি পাপাচার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের কাজ দীনের খেয়ানত কিংবা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে খেল-তামাশা করার তুল্য, যা কখনো বৈধ নয়।[১০১]

পাঁচ : অনেক সময় দেখা যায়, প্রাচীন কোন ফাত্ওয়াকে আঁকড়ে ধরে এর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ফাত্ওয়া দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে যেটি করণীয় তা হচ্ছে, পূর্বে প্রদত্ত ফাত্ওয়া বর্তমানের পরির্বর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে, যদি তা

---

৯৯. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৮৫

১০০. ইবনুল কাইয়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩

১০১. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

বর্তমানেও প্রযোজ্য হয় তাহলে সে অনুযায়ী ফাত্ওয়া দেয়া যাবে, অন্যথায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে বিদ্যমান ফাত্ওয়াটি হালনাগাদ করে নিতে হবে। তাইতো দেখা যায়, প্রশ্নকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। এছাড়াও দেখা যায়, অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে ফকীহগণও একই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। ইবনু আবিদীন বলেন:

> তাইতো দেখা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের মাযহাবের স্কলারগণ অনেক বিষয়ে মাযহাবের ইমাম তথা আবু হানীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন; কারণ তারা জানতেন, যদি তাঁদের ইমাম এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনিও তাদের মতামতের সাথে একাত্মতা পোষণ করতেন।[১০২]

৮. ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর করণীয়

এক: প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করা। যে সকল বিষয় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত। বলা হয়ে থাকে, حسن السؤال نصف العلم অর্থাৎ সুন্দর প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[১০৩]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

> আমি যে সকল বিষয়ে বলা থেকে বিরত থেকেছি সে সকল বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো না; তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশী বেশী প্রশ্ন করা এবং তাদের নবীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।[১০৪]

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর কিভাবে আছেন এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন:

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

---

১০২. ইবনু আবিদীন, নাশরুল আরফ ফিমা বুনিয়া মিন আল-আহ্কাম আলা আল-উরফ, *মাজমু'আত রাসায়েল ইবনে আবিদীন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫

১০৩. আল-কুরআন, ৫ : ১০১

১০৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : ফারদিল হাজ্জ মাররাতান ফিল উমর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০২, হাদীস নং-৩৩২১

আল্লাহ আরশের উপর আছেন এটা জানা বিষয়, কিভাবে আছেন এটা অজানা বিষয়, কিন্তু এর প্রতি বিশ্বাস থাকা আবশ্যক এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদআত (ইসলামে নতুন ধারা)।[১০৫]

দুই: ফাত্ওয়া জানতে চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর উচিত, সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাটি সত্যিকারভাবে মুফতীর সামনে উপস্থাপন করা। সাধারণত মুফতী তার সামনে উপস্থাপিত বর্ণনার আলোকেই ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন। তাই কোন বিষয়ের অবৈধতার ব্যাপারে প্রশ্নকারী যদি নিশ্চিত থাকে, অতঃপর ফাত্ওয়া ব্যবহার করে বৈধ করার লক্ষ্যে মুফতীর সামনে এটা কাটছাঁট করে উপস্থাপন করা তার জন্য জায়িয হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।[১০৬]

উম্মু সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا

তোমরা আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মীমাংসার জন্য এসে থাকো, অবশ্যই যুক্তি-তর্ক পেশ করার ক্ষেত্রে তোমাদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে বেশী ধূর্ত, আর আমিতো যা শুনি সে অনুযায়ীই মীমাংসা করি। সুতরাং তোমাদের বক্তব্য শুনে যদি আমি একজনের অধিকার অপরকে দিয়ে থাকি তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করো না; যদি তা গ্রহণ করো তাহলে তা হবে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণতুল্য।[১০৭]

তিন : মুফতীর নিকট কোন প্রশ্ন কিংবা কোন ঘটনা বর্ণনা করার সময় প্রশ্নকারীর উচিত, উক্ত প্রশ্ন বা ঘটনার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে খুলে বলা, যাতে সব কিছু জেনে-শুনে মুফতী সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান দিতে সক্ষম হয়।[১০৮]

চার: কোন মুফতীর প্রদত্ত ফাত্ওয়া মেনে নেয়ার ব্যাপারে যদি প্রশ্নকারীর মানসিক প্রশান্তি না আসে, তাহলে তার উচিত নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা, যদি তার সে যোগ্যতা

---

১০৫. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, ৪৫

১০৬. আল-কুরআন, ২ : ১৮৮

১০৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মান আকামা আল-বাইয়্যিনাহ বা'দ আল-ইয়ামিন, কায়রো, মাতবা'আ আল-আমিরিয়াহ, ১২৮৬ হিজরী, খ. ৯, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং-২৬৮০

১০৮. ইউসুফ আল-কারজাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

থাকে; অন্যথায় তার উচিত অন্য কোন একজন বা একাধিক মুফতীর মতামত সংগ্রহ করা, যতক্ষণ না প্রশান্ত অন্তরে সে তা মেনে নিতে সক্ষম হয়। ইবনুল কাইয়িম বলেন: "কোন ফাত্ওয়ার ব্যাপারে যদি অন্তরে পরিতৃপ্তি না আসে এবং তা গ্রহণ করতে সন্দেহ-সংশয় থেকে যায়, তাহলে সে ফাত্ওয়া অনুযায়ী কাজ করা জায়িয হবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেন : استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, যদিও মুফতীরা তোমাকে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকে।[১০৯]

৯. ফাত্ওয়া কার্যকর ও বাস্তবায়ন

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আইনী সিদ্ধান্তের ন্যায় ফাত্ওয়া বল প্রয়োগ উপযোগী নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানের সন্ধানদাতা। মুফতীর দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর বিধান জানিয়ে দেয়া; এর বাস্তবায়ন নয়। যদি ফাত্ওয়ার মধ্যে বাস্তবায়নের কোন বিষয় থাকে, যেমন নাগরিক অধিকার প্রদান, অর্থসংক্রান্ত মীমাংসা, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি, এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা রাষ্ট্রীয় কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা ইনস্টিটিউশনকে এর বাস্তবায়ন করতে হবে। মুসলিম স্কলারদের সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অন্য কেউ ইসলামী আইনের কোন শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারবে না।[১১০]

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ফাত্ওয়ার মাধ্যমে যে কোন শাস্তি (হুদূদ) বাস্তবায়ন ইসলামী আইনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, এবং ইসলামী আইনে শাস্তি প্রদানের যে দর্শন রয়েছে তার পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ادرؤوا الحدود بالشبهات

কোন সন্দেহ-সংশয় থাকলে তোমরা হদ্দ বাস্তবায়নে বিরত থাক।[১১১]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوبَةِ

তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের হদ্দ প্রদান রহিত কর, যদি শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় থাকে তাহলে তার মাধ্যমে অপরাধীকে মুক্ত করে দাও; রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ভুল করে শাস্তি প্রদানের চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করা অনেক উত্তম।[১১২]

---

১০৯. ইবনুল কাইয়িম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫৪

১১০. *আল-মাউসূ'আহ আল-ফিক্হীয়্যাহ*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯০, খ. ১৭, পৃ. ১৪৪

১১১. আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাক্বী, *সুনান আল-বাইহাক্বী আল-কুবরা*, অনুচ্ছেদ : বায়ান ধা'ফিল খাবার আল্-লাযি রুইয়া ফি ক্বাতলি আল-মু'মিন, মাক্কাহ মুকার্রামাহ : মাকতাবাত দারুল বায, ১৯৯৪, খ. ৪, পৃ. ৩১, হাদীস নং-১৫৭০০

বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ ধরনের যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে কোন হদ্দ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান সময়কালকে অনেকে ফিতনার যুগ, মূর্খতার যুগ, সন্দেহ-সংশয়ের যুগ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। অনেকে ইসলামী বিধান না জেনে অপরাধ করে থাকে। অনেকে অভাব-অনটনে পড়ে অপরাধ করে থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের পদস্খলন ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে থাকে। তাই দেখা যায়, রাসূলের স. মক্কার জীবনে হদ্দের বিধান অবতীর্ণ হয়নি; কারণ তখনকার সমাজব্যবস্থা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। খলিফা উমর রা. দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের প্রেক্ষিতে চুরির হদ্দ স্থগিত করেছিলেন; কারণ সেখানে এ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, হয়ত অনেকে অভাবের কারণে চুরি করতে বাধ্য হয়ে থাকবে। সুতরাং কোন ব্যক্তির উপর শাস্তি বাস্তবায়নের পূর্বে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, সমাজ ও রাষ্ট্র উক্ত অপরাধ থেকে তাকে দূরে রাখার জন্য ইতিমধ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।[১১৩]

উপরন্তু, হদ্দ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী আইনে যে সকল শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে হদ্দ বাস্তবায়ন অনেকাংশে অসম্ভব। তাই অনেকে এ শর্তাবলির নামকরণ করছেন তা'জীযিয়্যাহ (تعجيزية), অর্থাৎ: অনেকটা বাস্তবায়নে বাধা প্রদানকারী এবং অক্ষমকারী শর্ত। যেমন: ব্যভিচারের হদ্দ প্রদানের জন্য চারজন সাক্ষীর সরাসরি অপরাধকর্মে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে, যা অনেকাংশে অসম্ভব।[১১৪] তাই কোন ভিডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণ করে তার প্রেক্ষিতে শর'য়ী শাস্তি দেয়া যাবে না; কারণ তা নকল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আর সম্ভাবনা হদ্দকে রহিত করে দেয়। এছাড়াও অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার নির্দেশ এবং কারো দোষ ত্রুটি দেখার পর, যদি তার দ্বারা সামষ্টিক কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে তা গোপন রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

কেউ যদি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিও দুনিয়া এবং আখিরাতে গোপন রাখবেন।[১১৫]

---

১১২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : দারয়ুল হুদূদ, বৈরুত : দারু ইহয়া আত্-তুরাছ আল-আরবী, তা.বি., তাহকীক : আহমদ শাকির প্রমুখ, খ. ৪, পৃ. ৩৩, হাদীস নং-১৪২৪

১১৩. আলী জুম'আ, *হাক্বায়িক্ব হাওলা তাতবীক আশ্-শারীয়াহ ওয়াল হুদুদ*, গ্রহণ : ২/৭/২০১৫। ওয়েবসাইট: http://www.onislam.net/arabic/madarik/cultureideas/90481alsharea.html

১১৪. সালিম আব্দুল জলিল, শুরূতু তাতীবক আল-হুদূদ তাকাদু তাকূনু তা'জীযিয়্যাহ, গ্রহণ : ২/৭/২০১৫। ওয়েবসাইট : http://gate.ahram.org.eg/News/165994.aspx

১১৫. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অনুচ্ছেদ : আস্-সাতরু আলা আল-মু'মিন ওয়া দাফ' আল-হুদূদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ২৬৪১

দলীল-প্রমাণ কিংবা যুক্তি-তর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি প্রদান করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়; বরং শাস্তির বিধান দেয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে অপরাধবোধ জাগ্রত করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করার শিক্ষা দেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ স. দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে অপরাধী প্রমাণ করে কাউকে শাস্তি দেননি; বরং বারংবার ফিরিয়ে দেয়ার পরও পরপর চারবার স্বীকারোক্তি পাওয়ার পর তিনি শাস্তি বাস্তবায়ন করেছিলেন। সেক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন: যদি তারা অপরাধের কথা গোপন রেখে আল্লাহর নিকট তাওবা করে নিত তাহলে তা যথেষ্ট হতো।[১১৬]

মূলত ইসলামী আইনে শাস্তি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীকে ভয় প্রদর্শন, বারংবার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা, পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া, ইত্যাদি। তাই স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ স. তাদের ব্যাপারে বলেছিলেন:

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّة لَوَسِعَتْهُمْ.

সে এমন তাওবা করেছে যদি তা পুরো উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো তাহলে যথেষ্ট হতো।[১১৭]

ইসলামের শাস্তি প্রণয়নের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ। প্রখ্যাত ফিক্হী গ্রন্থ '*আল-ফাওয়াকিহ আদ্-দাওয়ানী*" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

الحد ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره، وفي معنى الحدود التعاذير، وحكمة مشروعيتها الزجز عن إتلاف ما حكى الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه من العقول والنفوس والأديان والأعراض والأموال والأنساب؛ فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة الحفظ للأموال، وفي الحد للزنا حفظ الأنساب، والحد للشرب حفظ العقول، وفي الحد للقذف حفظ الأعراض، وفي القتل للرده حفظ الدين، وقيل إن الحدود جوائز أي كفارات

বারংবার অপরাধ করা থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা এবং অন্যান্যদেরকে তা থেকে ভয় ও ধমকীস্বরূপ ইসলামে হদ্দের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে তা'যীরের বিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামে শাস্তির বিধানের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে: যে সকল বিষয়গুলো সুরক্ষা করার আবশ্যকতার ব্যাপারে স্কলারগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, ধ্বংস ও অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে নিরাপদে রাখা। সে বিষয়গুলো হচ্ছে: মানুষের জীবন, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধর্ম, মান-সম্মান, সহায়-সম্পত্তি এবং বংশ-পরিচয়। সুতরাং কি্সাসের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে মানুষের জীবনের সুরক্ষার জন্য, চুরির শাস্তি হচ্ছে সহায়-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য, ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে বংশ-পরিচয় ঠিক রাখার জন্য, নেশা করার শাস্তি হচ্ছে

---

১১৬. বিস্তারিত ঘটনা পড়ুন: ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অনুচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাফছিহি বিয্-যিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২০, হাদীস নং-৪৫২৮

১১৭. প্রাগুক্ত

মস্তিষ্কের সুরক্ষার জন্য, সতী নারীকে অপবাদ দেয়ার শাস্তি হচ্ছে মান-সম্মান নিরাপদ রাখার জন্য, এবং ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি হচ্ছে ধর্মকে নিঃশঙ্ক রাখার জন্য। বলা হয়ে থাকে: হুদূদ হচ্ছে কৃত অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ।[১১৮]
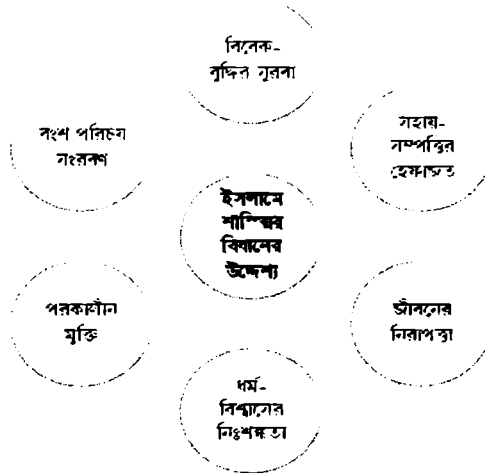
চিত্র ০৪: ইসলামে শাস্তির বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যসমূহ[১১৯]

অনুরূপভাবে প্রখ্যাত উসূলবিদ আল-আমিদী (৫৫১-৬৩১ হি.) বলেন:

المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والال، فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات.... أما حفظ الدين فبشرع قتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع، وأما حفظ النفوس فبشرع القصاص، وأما حفظ العقول فبشرع الحد على شرب الخمر

পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য যেগুলো সুরক্ষা করার ব্যাপারে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ধর্ম, জীবন, মস্তিষ্ক, বংশ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা। এ পাঁচটি বিষয় সুরক্ষা করা মৌলিক ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। সুতরাং অবিশ্বাসী এবং ধর্মদ্রোহিতার দিকে আহ্বানকারীকে হত্যা করার বিধানের মাধ্যমে ধর্মের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে, কি্সাসের বিধানের মাধ্যমে মানব জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, নেশা করার শাস্তির বিধানের মাধ্যমে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে, ইত্যাদি।[১২০]

---

১১৮. আহমাদ ইবনে গুনাইম আন-নাফরাওয়ী, *আল-ফাওয়াকিহ আদ্-দাওয়ানী আলা রিসালাত ইবনে আবী ইয়াযিদ আল-কাইরাওয়ানী*, বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হিজরী, খ. ২, পৃ. ১৭৮

১১৯. লেখকের নিজস্ব চিত্রায়ণ

১২০. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফি উসূল আল-আহকাম*, বৈরূত : দারুল কিতাব আরবী, ১৪০৪ হিজরী, খ. ৩, পৃ. ৩০০

সুতরাং ইসলামে শাস্তির বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সার্বিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, অকল্যাণকে প্রতিহত করা, সম্ভাব্য সকল অপরাধ থেকে মানব সমাজকে সুরক্ষা করা, অপরাধীর সুবিচার নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা।[১২১]

১০. উপসংহার ও সুপারিশ

ফাত্ওয়া মানব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যকীয় একটি বিষয়। বাংলাদেশে ফাত্ওয়া নিয়ে সময়ে সময়ে তুমুল বিতর্ক হতে দেখা যায়। ফাত্ওয়া নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের উপর্যুক্ত রায় এ সকল বিতর্ক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে সহায়ক হবে। ফাত্ওয়া সংক্রান্ত উপর্যুক্ত রায় নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের জন্য একটি মাইলফলক। আমরা আশা করব, সুপ্রিমকোর্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন অব্যাহত রাখবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নয়ন, জ্ঞানের বিভিন্ন জটিল ও সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভের কারণে দু'এক ব্যক্তির পক্ষে সব বিষয়ের ইসলামী সমাধান দেয়া অনেকাংশে অসম্ভব। এছাড়াও মুফতী হওয়ার জন্য উপরে যে সকল জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তির মধ্যে এ সকল জ্ঞানের সমাহার হওয়া বর্তমানে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেকটা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলামী ফিক্হ একাডেমি ওআইসি সহ প্রায় উল্লেখযোগ্য সকল স্কলারগণ বর্তমানে সামষ্টিক গবেষণা এবং সামষ্টিকভাবে কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ লক্ষ্যেই মিসর, সউদি আরব, জর্দানসহ আরব ও ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ফাত্ওয়া কাউন্সিল, ফাত্ওয়া প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদি গড়ে ওঠেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা বাংলাদেশেও ইসলাম ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও কুশলীদের নিয়ে এ ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সুপারিশ করছি। কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত এ কমিটি বাংলাদেশে দৈনন্দিন ও সময়ে সময়ে ঘটিত বিভিন্ন বিষয়ে ফাত্ওয়া দিবে, ফাত্ওয়া দেয়ার নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং ফাত্ওয়া নিয়ে সংঘটিত সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ করবে। আশা করি, এর মাধ্যমে ফাত্ওয়া সংক্রান্ত জটিলতা এবং সমস্যাবলি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তবে এ কমিটির যাতে অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে এবং এ লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত মুফতীর যোগ্যতা, দক্ষতা, ও ফাত্ওয়া প্রদানের নীতিমালা ইত্যাদির চর্চা ও প্রয়োগ পুরোপুরি নিশ্চিত করতে হবে।

---

[১২১]. আবদুল মালিক আবদুল মাজীদ, আগরাদুল উকূবাত ফি আশ-শারীয়াহ আল-ইসলামিয়াহ ওয়া মাদা ফায়েলিয়াতুহা ফিল 'উসূর আল-মাদীয়াহ ওয়াল হাদীসাহ, *মাজাল্লাত আল-'উলূম*, ১৪৩৩ হিজরী, খ. ১১, পৃ. ১৮

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

[**সারসংক্ষেপ :** *৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদীনায় হিজরাতের পর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ স.-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মদীনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স. এ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পরিক্রমা শুরু করেন। সনদ বহির্ভূত গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে সনদভুক্ত পক্ষসমূহের আচরণ কী হবে তিনি এ সনদে তা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন দেশের শাসকগণের নিকট ইসলামের আহ্বান প্রেরণ করা, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণের রূপরেখা নির্ধারণ করা, বাহ্যত পরাজয়মূলক হওয়ার পরও শান্তির স্বার্থে সন্ধি সম্পাদন করা, ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে শত্রুরাষ্ট্রে অভিযান প্রেরণ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির রূপরেখা প্রদান করেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে খুলাফায়ে রাশিদীন রাসূলুল্লাহ স.-এর বৈদেশিক নীতির প্রায়োগিক পরিপূর্ণতা দান করেন। উমাইয়া–আব্বাসীয় সাম্রাজ্য যেমন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না তেমনি তাদের অনুসৃত বৈদেশিক নীতিও ইসলামী হুকুম–আহকাম বা আদর্শজাত ছিল না। কিন্তু এ সকল রাজবংশের কার্যক্রমকে উপজীব্য করে প্রায়শ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে নেতিবাচক সমালোচনা করা হয়। অনেক সমালোচক আবার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত সময়কালের [৬২২–৬৬১ খ্রি] বৈদেশিক নীতির অবস্থিতি অস্বীকার করেন। তারা দাবি করেন, আধুনিক পাশ্চাত্যই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে এবং এ জন্য সুস্পষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর আগে পৃথিবীতে বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রবিষয়ক কোনো নীতি ছিল না। কেননা তখন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, এ দাবি সর্বৈব অসত্য এবং ভিত্তিহীন। কারণ বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা উদ্ভবের অনেক আগে থেকে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিলো। এ জন্য গোড়া থেকেই তারা প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ স.-এর আবির্ভাবের পর রাষ্ট্রসমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব ধারা সূচিত হয়েছিলো। খুলাফায়ে রাশিদীন এ আদর্শকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির বিষয়টিও বাস্তব রূপ লাভ করেছিল আল–কুরআনের মূলনীতি ও আল্লাহর রাসূল স.-এর নির্দেশনার ভিত্তিতে। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ স. ও খলীফাগণের মদীনা রাষ্ট্রে অনুসৃত বৈদেশিক নীতি উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সমালোচকদের সমালোচনার অসারতা প্রমাণের সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।*]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

ইসলামী রাষ্ট্র

সাধারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, পূর্ণাঙ্গ সরকার ও সার্বভৌমত্বই হলো রাষ্ট্রের মৌল উপাদান ও লক্ষণ।[১] জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা, যার আরবি পরিভাষা হচ্ছে দাওলাহ, তা ইউরোপের সার্বভৌমত্বের (সিয়াদাহ) ধারণার মতই সাম্প্রতিক ধারণা ও পরিভাষা। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সাথে জাতি-রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা সম্পৃক্ত এবং সার্বভৌমত্বের ধারণাটি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্র-দার্শনিক জ্যাঁ বোদাঁ (Jean Bodin) (১৫৩০–৯৬ খ্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত। এ কারণে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্রের পরিভাষাটি যেমন আল–কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তেমনি রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও এ পরিভাষাটি প্রচলিত ছিল না।[২] প্রথম যুগের ফকীহগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বুঝাতে খিলাফত বা ইমামত শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। হিজরী সপ্তম শতকের প্রথম দিকে দাওলাহ পরিভাষাটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ক্ষমতাহীন খলীফার নামেমাত্র আনুগত্যশীল মুসলিম রাজবংশকে বুঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩] তবে খিলাফত শব্দের বিকল্প হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিভাষাটি আরো আট শতাব্দী পেরিয়ে যায়।[৪]

যদিও রাষ্ট্র বা রাজনীতি শব্দদ্বয় আল–কুরআনে ব্যবহৃত হয়নি, তবে যে অপরিহার্য উপাদানসমূহ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে, সেগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ আল–কুরআনে রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, পারিভাষিকভাবে উল্লেখিত না হলেও আল–কুরআন রাষ্ট্র ও রাজনীতির বিষয়গুলো আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবেই উল্লেখ করেছে।[৫] একে ইসলামী রাষ্ট্র, খিলাফত বা অন্য যে কোনো নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এটি হবে আল–কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। তাই আল–কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক সংগঠিত ও পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক মুসলমান না হলেও তা হবে ইসলামী রাষ্ট্র।[৬]

---

১. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, আগস্ট ২০০০, পৃ. ৩৪৩

২. Ahmet Davutoglu, *Alternative Paradigms : The Impact of Islamic and Western Western Weltanschauung on Political Theory,* Maryland : University Press of America, 1994, p. 190

৩. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত–তাবারী, *তারীখ আত–তাবারী*, সম্পাদনা : এম. জে. দি. গোয়েজি, লেইডেন : ই. জে. ব্রিল, ১৯৯১, খ. ১১, পৃ. ৮৫–১১৫

৪. Hamid Enayet, *Modern Islamic Political Thought,* London : MacMillan Press, 1981, p. 69

৫. Mazeed Kadduri, *The Nature of the Islamic State,* Islamic Culture, Vol. 21, 1947, p. 327

৬. গবেষণা বিভাগ সংকলিত *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, (এ জেড এম শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৪, পৃ. ৪২

মুহাম্মাদ স. এর প্রতিষ্ঠিত মদীনারাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল। এ রাষ্ট্রে ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ স. রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাধারণের মতামত উপেক্ষা করতেন না। জরুরি পরিস্থিতিতে তিনি জনগণের পরামর্শও গ্রহণ করতেন।[৭] মদীনা সনদের কতগুলো ধারা হতে অনুধাবন করা যায় যে, মদীনারাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে রাষ্ট্রে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া গোত্রীয় প্রথা অটুট রেখে আরব ও ইহুদি গোত্রগুলোকে মদীনা সাধারণতন্ত্রে যোগদানের সুযোগ দেয়া হয় এবং আল্লাহর যিম্মা ও মুহাম্মাদ স.-এর তরফ হতে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মুহাম্মাদ স.-এর নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৮] ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বকালীন বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীর যে কোনো দেশে, যে কোনো সময়ে মুহাম্মাদ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা ইসলামী রাষ্ট্র নামেই আখ্যায়িত হবে। বলা বাহুল্য, এ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিও হবে রাসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির অনুরূপ।

বৈদেশিক নীতি

সাধারণত বৈদেশিক নীতি বলতে বুঝায় কোনো রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে সকল রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখতে বাধ্য হয়। ব্যাপকার্থে বৈদেশিক নীতি বলতে বিদেশের সাথে সম্পর্কের যাবতীয় দিককেই বুঝায়।[৯]

বৈদেশিক নীতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণের ধরন নিয়ে বৈদেশিক নীতি গড়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতি হলো নির্দিষ্ট আন্তঃরাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অনুসরণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিশেষ। বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে যে কোনো রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্তকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকে। এটি বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্ত সংবেদন বা প্রতিক্রিয়া। এর সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম জড়িত। আন্তর্জাতিক সমাজে

---

৭. S. A. Q. Hussaini, *Constitution of the Arab Empire*, Lahore : 1958, p. 2-4

৮. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী : বুকস প্যাভিলিয়ান, পৃ. ১৯

৯. প্রফেসর ফিরোজা বেগম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ৩৩০

প্রতিটি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের রূপরেখা বৈদেশিক নীতির প্রধান উপজীব্য। এর মাধ্যমেই কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিবেশে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

Padelford, Lincon & Olvey বলেন,

> Foreign Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific course of action in order to achieve its objectives and preserve its interests.[10]
>
> বৈদেশিক নীতি হলো কোনো প্রক্রিয়ার সম্যক ফল, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যাবলি অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোনো রাষ্ট্র তার বিস্তৃতভাবে চিন্তিত লক্ষ্য ও স্বার্থকে সুনির্দিষ্ট কার্যে পরিণত করে।

বৈদেশিক নীতির মধ্যে নিহিত থাকে দীর্ঘকালব্যাপী অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী স্বার্থ, যা কোনো দেশ সবসময়ই সংরক্ষণ করতে ও সেই সাথে বাড়াতে চেষ্টা করে এবং সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কোনো ব্যাপারে ঐ দেশের নীতির বিশেষ ঘোষণা, যা সে দেশের মূল স্বার্থের সাথে জড়িত।[১১]

তাই বৈদেশিক নীতি বলতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া, বর্তমান ও প্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের ক্রিয়া-কলাপের সমষ্টিকে বোঝায়। জাতীয় স্বার্থ, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য

সাধারণ একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, নাগরিকগণের জন্য উন্নতমানের জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা, শত্রু রাষ্ট্রের তুলনায় মিত্র রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ানো, অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা, জাতীয় মর্যাদা সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়সমূহকে বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে।[১২] ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির এগুলো অন্যতম উপলক্ষ্য; কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হলো ইসলামের সর্বজনীন ও সর্বকালীন দাওয়াহ পেশ করা এবং একে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র আপাদমস্তক একটি দাঈ (আহ্বানকারী) প্রতিষ্ঠান। শাসন করা, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা, বাতিলকে

---

১০. Norman J. Padelford, George A. Lincon & Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics,* New York : MacMillan Publishing Co., 3rd Edition, 1976, p. 201

১১. মোঃ আবদুল হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি,* ঢাকা : ব্র্যাক প্রকাশনা, ডিসেম্বর ১৯৯৫, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২২৮

১২. ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি,* ঢাকা : বুক সোসাইটি, সেপ্টেম্বর ২০০১ ৭ম সংস্করণ, পৃ. ২৮২-৮৩

পরাজিত করা এসবই দাওয়াতের বিস্তৃতির মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ স.-কে কী দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা থেকেও ইসলামী রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾

হে রাসূল, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন। আপনি যদি তা প্রচার না করেন তাহলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।[১৩]

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সঠিক দীনসহ সকল দীনের উপর সুপ্রকাশিত ও জয়যুক্ত করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[১৪]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং দওয়াহ পেশের কাম্য পরিবেশ বিনির্মাণের জন্য এ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির আরও কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন,

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা। যেন দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কার সাথে এ লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ স. 'বাহ্যত পরাজয়মূলক' হুদায়বিয়া সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন। চূড়ান্তভাবে যা 'ফাতহুম মুবীনে' পরিণত হয়েছে।[১৫]

২. নির্যাতনের অবসান ঘটানো, যেন মানুষ ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সাধারণভাবে সকল মানুষ নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করে। কারণ ইসলাম মানুষকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছে। মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পৃথিবীর যে দেশে যখনই মানুষ নিপীড়নের শিকার হবে, ইসলামী রাষ্ট্র সাধ্যানুসারে তার প্রতিবিধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কারণ এটি মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

---

১৩. আল-কুরআন, ৫ : ৬৭

১৪. আল-কুরআন, ৯ : ৩৩, ৬১ : ৯

১৫. অনেকের মতে, সূরা আল-ফাতহে উল্লেখিত 'ফাতহুম মুবীন' (আল-কুরআন, ৪৮ : ১) দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। (দ্র. ইমাম আল-বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতু হুদায়বিয়াহ, হাদীস নং- ৩৯১৯)

তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছো না এবং যুদ্ধ করছো না অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জন্য? যারা বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের এ জনপদ থেকে মুক্ত করুন। আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করে দিন, আপনার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দিন।[১৬]

রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগের মুতা ও তাবুক অভিযান এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসরসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানগণ সামরিক যে অভিযানসমূহ প্রেরণ করেছিলেন সেগুলো মূলত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং মানবতার সম্মান সুরক্ষারই প্রয়াস ছিল। এ কারণেই অভিযানসমূহে নির্যাতনকারী শাসকগোষ্ঠীর পরাজয়ের পর সাধারণ মানুষের একটি বসতবাড়ি আক্রান্ত হয়নি, একজন সাধারণ লোকও অপদস্থ হননি।[১৭]

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পণ্য হালাল উপায়ে লাভ করার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক বাজার তৈরির ক্ষেত্রেও এ রাষ্ট্র দা'ওয়াহকেই মুখ্য বিবেচনা করবে। এ কারণে এমন পণ্যের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হবে না, যার উৎপাদন, বিপণন ও ভোগ ইসলামে হালাল রাখা হয়নি। ব্যবসায় হবে এমনভাবে যে, পণ্যের সাথে সাথে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ ইসলামী লেন-দেন, বিক্রয়-বিপণনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবে, পরিণামে ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হবে। এ কারণেই দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে ৭১০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইসলামের আগমন হলেও রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবৎকালেই যে সমুদ্রপথে আগত বণিকদের মাধ্যমে তাওহীদের বাণী উপমহাদেশে পৌঁছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৮]

৪. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষা। রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র ছিল একটি। এ কারণে সে সময়ে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস বিদ্যমান ছিল। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। ইসলামী আদর্শের অনুসরণে এর কোনো একটি বা কয়েকটি কিংবা সবগুলোই যদি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন সে ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের আবশ্যকীয়

---

১৬. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

১৭. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯, ৮৫-৯৮

১৮. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলায় ইসলাম* (ড. কে এম মোহসীন, ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও ড. এম এ আজিজ সম্পাদিত *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*) ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ১৭৬

বৈদেশিক নীতি হবে, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা। আল্লাহ তা'আলা এ ঐক্যের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বলেছেন,

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾

তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দীন ধারণ কর এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।[১৯]

সুতরাং বর্তমানে সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, ইসলামী বিশ্বের ঐক্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে একতাবদ্ধ করতে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করা।[২০]

৫. অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে প্রয়োজনের সময় সামরিক ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা।
৬. বিশ্বের যে কোনো স্থানের সকল কল্যাণকর উদ্যোগে সাধ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ভূমিকা রাখা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

ভাল কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না।[২১]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি

ইসলামী শরীআতের প্রথম এবং প্রধান উৎস আল-কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি। আল-কুরআনের নির্দেশ ও নির্দেশনা অনুসারে ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে। এ নীতির দ্বিতীয় প্রধান ভিত্তি হবে রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ বা কর্মনীতি ও আদর্শ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো আর যা থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেন, তা থেকে বিরত থাকো।[২২]

রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিষ্ঠিত মদীনারাষ্ট্র বৈদেশিক ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছে, যে আদর্শ স্থাপন করেছে নিঃসন্দেহে তা আল-কুরআনে পেশকৃত মূলনীতির বাস্তবরূপ ছিল। এ সময় বৈদেশিক নীতির যে ক্ষেত্র ও ধারাগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ

---

১৯. আল-কুরআন, ৩ : ১০৩
২০. মুফতি মুহাম্মদ তকী উসমানী, *রাজনীতি : ইসলামী চিন্তাধারা,* অনুবাদঃ রেজাউল করিম, ঢাকা : মাকতাবাতুত তামাদ্দুন, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৩৯
২১. আল-কুরআন, ৫ : ২
২২. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

হয়নি সেগুলোসহ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রায়োগিক পূর্ণতা সাধিত হয়েছে খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনামলে। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তৃতীয় প্রধান ভিত্তি খুলাফায়ে রাশিদীনের বৈদেশিক নীতি ও আদর্শ। এরপর পর্যায়ক্রমে ইজমা ও কিয়াস পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে সক্রিয় থাকবে। বলা বাহুল্য, কোনো ক্ষেত্রেই তা আল-কুরআনের মূলনীতি, রাসূল স. অনুসৃত পথ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রায়োগিক বাস্তবতার চেয়ে আলাদা হতে পারবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপাদান

কতগুলো মৌল উপাদান দ্বারা একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত হয়। সাধারণত রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, জনসমাজের সংহতি, সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিল্প-কারখানা, জনসংখ্যা, মৌলিক চাহিদা পূরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল উৎপাদনে সক্ষমতা, আর্থ-সামাজিক বা ধর্মীয় আদর্শ, রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তাধারা ও আদর্শ ইত্যাদি বিষয় বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।[২৩] এ বিষয়গুলো ছাড়া একটি রাষ্ট্রের জন্য কোনটি নিরাপদ, কোনটি ভীতিকর, কোনটি বাঞ্ছনীয় ও কোনটি বর্জনীয়, সে সম্পর্কে মানুষ জাতীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হতে যে শিক্ষা লাভ করে, তাও স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির মতো রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।[২৪] এ কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলোও একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া ও জলবায়ু, আয়তন, জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনসমাজের সংহতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রের সক্ষমতা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, সহযোগিতা ও শত্রুতার ধারা, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনে সক্ষমতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জাতীয় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ও বৈদেশিক নীতির উপাদান হিসেবে গণ্য হয়; তবে এগুলো প্রাসঙ্গিক উপাদান। মূল উপাদান ইসলামী শরী'আহ, জনগণ এবং মানবকল্যাণ। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের মানসিকতা, দর্শন বা আদর্শ বৈদেশিক নীতির উপাদান হয় না। কেননা ইসলামী শরী'আতের বিধানের বাইরে এ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের ভিন্ন কোনো চিন্তা, অন্য কোনো আদর্শ, নিজস্ব কোনো দর্শন থাকবে না। শরঈ বিধান অনুসারে বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁর ভিন্ন কৌশল থাকতে পারে; কিন্তু তা কখনোই শরী'আতের অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করবে না।

---

২৩. ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *আন্তর্জাতিক রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩-৮৪

২৪. Norman J. Padelford, George A. Lincon & Lee D. Olvey, *The Dynamics of International Politics,* ibid, p. 4-5

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মৌলিক দিকসমূহ

ইসলামী রাষ্ট্র আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র, শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের পথের আহ্বায়ক রাষ্ট্র। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রকে তাই সর্বোচ্চ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং এ সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে হয়। এ লক্ষ্যে ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করে তাতে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, যুদ্ধ নীতি, বিশ্বশান্তির ধারণা, যুদ্ধবন্দী নীতি, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপনীতি, যুদ্ধাস্ত্র সীমিতকরণ নীতি, কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতি, একক ও পারস্পারিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি, সামরিক ঋণচুক্তি, রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং বিজিত এলাকা শাসননীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

১. চুক্তিপালন

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হোক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হোক, ইসলাম তা পালন করার জোর তাগিদ দিয়ে থাকে। কেননা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন করা বা রক্ষা করা মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক দাবি। ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ সবার আগে চুক্তি পালন ও ওয়াদা পূরণের শিক্ষা পেয়ে থাকে। সামষ্টিক জীবনের স্থিতিস্থাপকতার জন্য যে কোনো পর্যায়ের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসপরায়ণতা জীবনের মূলভিত্তি। প্রতিশ্রুতি পূরণ ছাড়া এ ভিত্তি রক্ষা পেতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾

> তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা পূরণ করো। কেননা এ সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।[২৫]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন তাতেও অনিবার্যভাবে চুক্তি পালন ও ওয়াদা পূরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি বলেছেন:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

> আর সফল হয়েছে সে সব মুমিন লোক যারা তাদের আমানতসমূহ এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ সতর্কতার সাথে রক্ষা করে।[২৬]

ওয়াদা পালনকারীরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। কুরআন মাজীদে ওয়াদা পালনকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾

> তারা এমন লোক যারা আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না।[২৭]

---

২৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৪
২৬. আল-কুরআন, ২৩ : ০৮
২৭. আল-কুরআন, ১৩ : ২০

এর বিপরীতে যারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাদের মন্দ বলা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

যারা আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় ওয়াদা করার পর তা ভেঙে ফেলে, যে সম্পর্ক আল্লাহ রক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিশম্পাত আর তাদের বাসস্থান কতই না মন্দ![২৮]

আল্লাহ তা'আলার নামে পারস্পরিক যে ওয়াদা করা হয় তা পূরণ করা আবশ্যক এবং তা ভঙ্গ করা হারাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

যখন তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে একে অপরের সাথে ওয়াদা করবে, তখন আল্লাহর সে ওয়াদা পূর্ণ করবে। আল্লাহকে যামিন করে সুদৃঢ় ওয়াদা করার পর তোমরা তা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। তোমরা সে পাগল মহিলার মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকানোর পর সূতাগুলোর পাক খুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা একদল অন্যদলকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তোমাদের আল্লাহর নামের শপথ ব্যবহার করে থাক, যেন একদল অন্যদলের চেয়ে লাভবান হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেবেন।[২৯]

ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করা মুনাফিকের চিহ্ন। তাই কোন মুসলিম কখনো কারো সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করতে বা এর বিপরীত কাজ করতে পারে না। যেহেতু মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে[৩০] সেহেতু মুনাফিকের কোন বৈশিষ্ট্য ধারণ করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। মুনাফিকের চিহ্ন বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : এক. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, দুই. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তিন. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে।[৩১]

---

২৮. আল-কুরআন, ১৩ : ২৫
২৯. আল-কুরআন, ১৬ : ৯১-৯২
৩০. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৫
৩১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : 'আলামাতুল মুনাফিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩

তা ছাড়া অন্য এক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মুসলিমরা সর্বদা তাদের আরোপিত বা প্রণীত শর্তাবলী মেনে চলবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর অটল থাকতে বাধ্য।[৩২]

আল্লাহ তা'আলার এ সকল ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ স. এর নির্দেশনার আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র বৈধভাবে স্বাক্ষরিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ মর্যাদা দানের ঘোষণা প্রদান করে।

২. যুদ্ধনীতি

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাধারণত সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে ভিন্ন এলাকা বা রাজ্য দখল করে মানুষকে অধীন করা হয়। অন্য দেশের উপর আক্রমণ করে সে দেশে বাণিজ্যোপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হয় বা সে দেশে নিজের দেশের লোকদের অবাধ উপার্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে দেশে নিজ দেশের শিল্পজাত পণ্যের বাজার তৈরি করা হয়। সে দেশে মূলধন বিনিয়োগ করে শ্রম শোষণের পথ তৈরি করা হয়। কাঁচামাল সমৃদ্ধ দেশ থেকে জ্বালানী থেকে শুরু করে হীরা-সোনা পর্যন্ত সব ধরনের কাঁচামাল আত্মসাৎ করা হয়। প্রয়োজনে যুদ্ধ তৈরির পরিবেশ রচনা করে সমরাস্ত্র বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

আল-কুরআন এ সকল কারণের কোনো একটির জন্যও অন্যদেশ বা জাতির উপর আক্রমণ পরিচালনার অনুমতি দেয়নি। এমন একটি আয়াত সমগ্র কুরআন মাজীদ খুঁজেও পাওয়া যাবে না, যাতে এ ধরনের কোনো প্রয়োজনে কোনো দেশ দখল করার আদেশ বা অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসও প্রমাণ করে, এমন উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ স. বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কোথাও আক্রমণ পরিচালনা করেননি। শুধু তাই নয়, বরং যে সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি রয়েছে সেসব দেশের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে যুদ্ধ করার এবং অতর্কিতে আক্রমণ করার অনুমতিও আল-কুরআনে দেয়া হয়নি। ইসলামের যুদ্ধনীতি ব্যাখ্যা করে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ

---

[৩২]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : আস-সুল্‌হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৯৬; হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল*, বৈরূত : আল মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-১৩০৩

يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾

মুনাফিকরা কামনা করে, তারা যেমন কুফরি করেছে, তোমরাও যেন তেমন কুফরি কর; যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই আল্লাহ তা'আলার পথে হিজরত করে চলে না আসা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে ধর এবং তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর। তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ কর না। কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে অথবা যারা এমন অবস্থায় তোমাদের নিকট আসে যে, তাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে বা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সঙ্কুচিত হয় তাদের বিষয় আলাদা। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতাবান করে দিতেন এবং তারা অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ববস্থা গ্রহণের পথ রাখেননি। এ ছাড়াও এমন কিছু লোককে তোমরা পাবে, যারা তোমাদের থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, কাফিরদের নিকট থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়। যখন তাদেরকে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়কর কাজে আহ্বান করা হয়, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে বিরত না রাখে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাবে ধরবে ও হত্যা করবে। এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট অধিকার আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।[৩৩]

আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণাসমূহের তাৎপর্য হলো–

১. মুশরিক, মুনাফিক ও পরিচিত ধর্মদ্রোহী লোকদের সাথে বন্ধুত্ব জায়িয নয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা ইসলাম কবুল করবে না বা কাফির রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসবে না তাদেরকে মুসলিমদের বন্ধু বা মিত্র মনে করা যায় না। কেননা এমন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ ও হিজরাত করাই হলো ইসলামের পক্ষে থাকার প্রমাণ।

৩. তারা যদি তাদের অবস্থানে অনড় থাকে তাহলে তাদেরকে ধরা এবং যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই হত্যা করা যাবে। কেননা তা না হলে তারা মুমিনদেরকে

---

৩৩. আল-কুরআন, ০৪ : ৮৯-৯১

হত্যা করবে। কখনোই তারা মুমিনদের বন্ধু বা সাহায্যকারী হবে না। বরং যে কোনোভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

৪. যাদের সাথে কোনো রকমের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত আছে তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, হিজরাত করুক অথবা না করুক তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। এমনকি কোনো মুসলিম দলও যদি তাদের সাথে মিলে যায় তাহলে তাদেরকেও চুক্তির আওতাভুক্ত ধরে নিতে হবে। কেননা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বাস্তবসম্মত কারণে হিজরাত করা সম্ভব হয় না।

৫. যারা চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে মিলিত হবে বা যারা মুমিনদের বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না বা করার সাহস নেই বরং সন্ধি করতে আগ্রহী তাদের সাথেও যুদ্ধ করা যাবে না।

৬. শান্তি চুক্তি থাকা সাপেক্ষে কাফিরদের সাথেও যুদ্ধ করা যাবে না।

৭. যারা মুমিনদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পরিচয় দেয় আর তাদের নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর সুযোগ পেলেই কোনো না কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদেরকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই ধরা ও হত্যা করা যাবে। কেননা তারা প্রকাশ্যে মুনাফিকী করছে এবং মুমিনদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক নীতি হিসেবে তাই যে কারো সাথে যুদ্ধ বা ব্যক্তি স্বার্থে যুদ্ধ করার ধ্বংসাত্মক নীতি বর্জন করেছে। এমনকি যে মুশরিকদেরকে মুমিনদের কঠোর শত্রু ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾

আপনি সকল মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকদেরকে মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন পাবেন।[৩৪]

সে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি পালনের ব্যাপারেও ওয়াদা পালনের তাকীদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো এবং পরে যারা তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি পালনে কোন ভুল করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের ভালবাসেন।[৩৫]

---

৩৪. আল-কুরআন, ০৫ : ৮২

৩৫. আল-কুরআন, ০৯ : ৪

কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কাফির-মুশরিকদেরকে বা মুমিনদের শত্রুদের সাহায্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। যেমন,

﴿ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ﴾

তোমাদের সাথে চুক্তির পর তারা যদি তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তাহলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর, কেননা এরপরে অবশ্যই তাদের সাথে তোমাদের আর কোন চুক্তি অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত তারা বিরত থাকবে।[৩৬]

কাফিরদের সাথে স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়া সন্ধি চুক্তি (৬২৮ খ্রি) রক্ষায় রাসূলুল্লাহ স. নযীরবিহীন ভূমিকা পালন করেছেন। এ চুক্তির একটি ধারায় লিখিত ছিলো,

অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কুরায়শের কেউ যদি (মক্কা থেকে) মুহাম্মাদের নিকটে (মদীনায়) চলে যায়, তবে তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মাদের কোন সাথী যদি কুরায়শদের কাছে চলে আসে, তবে তারা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।"[৩৭]

চুক্তি স্বাক্ষরের পর আবু জান্দাল রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। ইসলাম কবুল করার কারণে মক্কার কাফিররা তাকে শিকলে বেঁধে নানাভাবে নির্যাতন করছিলো। সন্ধির শর্তানুসারে কাফিররা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন: হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে পুনরায় তুলে দেয়া হবে আর তারা আমার দীন বরবাদ করবে? এ প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ স. বললেন:

يَا أَبَا جَنْدَل اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا ، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَعْطَوْنَا عَهْدَ اللَّهِ وَإِنَّا لا نَغْدِرُ بِهِمْ

হে আবু জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর এবং বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার এবং তোমার দুর্বল মুসলমান সাথীদের জন্য নিষ্কৃতির বন্দোবস্ত করে দেবেন। আমাদের এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তির বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হয়েছি। আর এ ব্যাপারে আমরা এবং তারা আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আর এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাই না।[৩৮]

---

৩৬. আল-কুরআন, ০৯ : ১২

৩৭. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী, *সীরাতুন নবী স.*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৩ (৩য় সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ৩৩০

৩৮. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী র., *সীরাতুন নবী স.*, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১-৩২

কারো উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা ইসলামের রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ স. তাঁর সকল যুদ্ধে অনাক্রমণ নীতি অনুসরণ করেছেন। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। অপ্রস্তুত কাউকে আক্রমণ করা যেমন ইসলামের রীতি নয়, তেমনি যুদ্ধকে এড়ানোর কোনো চেষ্টাই বাদ না রাখা ইসলামের রীতি।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ স. ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে যুদ্ধ শুরুর আগে শত্রুপক্ষ আলাপ-আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকলে মুসলমানগণ তাতে সম্মত হতেন। এসব আলাপ-আলোচনার ফলে অনেক সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হতো। যেমন ইরাক ও সিরিয়ার অনেকগুলো শহরের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবার কোথাও কোথাও মতবিরোধের কারণে আলোচনা হঠাৎ করে ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে। কাদিসিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধের আগে পারসিক সেনাপতি রুস্তম ও মুসলিম সেনাপতি সাদ বিন ওয়াক্কাসের আলোচনা আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল।[৪০]

এ সব কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে যুদ্ধের ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিধি ও প্রথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১. সাধারণভাবে কোন দেশ, গোত্র বা জাতিকে পদানত করার জন্য যুদ্ধ করা যাবে না;
২. কোনো দেশে বাণিজ্য সুবিধা লাভের আশায় সে দেশে আগ্রাসন চালানো যাবে না;
৩. কোনো দেশে বা অঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার তৈরির জন্য আক্রমণ করা যাবে না;
৪. কোনো দেশে মূলধন বিনিয়োগ করে শ্রম শোষণের জন্য আক্রমণ করা যাবে না;
৫. সমরাস্ত্র বিক্রির অশুভ ইচ্ছায় কোনো দেশে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করা যাবে না;
৬. চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সাথে কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ করা যাবে না, যতক্ষণ না তারা সরাসরি চুক্তিবিরুদ্ধ কোনো কাজ করে বা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয়;
৭. বিনা কারণে কোন দেশ, জাতি, গোত্রে সমরাভিযান পরিচালনা করা যাবে না;
৮. যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে না, মুমিনদের ক্ষতি করার কোনো চেষ্টা করে না, মুমিনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কাউকে বা কোনো গোষ্ঠীকে সাহায্যও করে না তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না;
৯. যারা মুমিনদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা তাদের শত্রুদের সাহায্য করে এমন কাফির, মুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান যে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে;
১০. শান্তি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। সবসময় যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করা হবে। কোনোভাবে এড়ানো না গেলেই কেবল চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ করা যাবে।

---

৩৯. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান, মোখলেছুর রহমান ও ড. শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৯, ৮৫-৯৮

৪০. ইমাম আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি., খ. ২, পৃ. ৩৮৯-৩৯২

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির সাথে শান্তি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে তাই বিশ্বশান্তির বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে। বিশ্বশান্তির জন্য যে মানবিক আদর্শের প্রয়োজন তা রয়েছে কেবল ইসলামেই। এর বড় প্রমাণ ইসলাম শব্দটি নির্গত হয়েছে 'সিলমুন' ধাতু থেকে, যার এক অর্থ সন্ধি, সমৃদ্ধি ও শান্তি। এ শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকেই মুমিনদেরকে আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।[৪১]

ইসলামী রাষ্ট্রের এ শান্তিবাদী বৈদেশিক নীতির কারণেই কোনো শত্রুও যদি শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী হয়, তা হলে তার সাথে সন্ধির হাত মিলাতে দ্বিধা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন,

﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

কাফিররা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করতে আগ্রহী হবেন এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।[৪২]

কুরআনের চিরন্তন আহবান হচ্ছে শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি ক্ষুদ্র পারিবারিক পরিবেশেও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ইসলামই করেছে। কেননা বৃহত্তর পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগে প্রয়োজন ক্ষুদ্র পরিসরে শান্তি প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ আর সন্ধিই হলো সর্বোত্তম।[৪৩]

ইসলাম সকল মুমিন নর–নারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছে। তাদের মধ্যে কোনো রকম বিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা দূর করে অবিলম্বে সন্ধি করে দেয়ার আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। তাই তোমরা তোমাদের এ ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে সম্ভবত তোমাদেরকে দয়া করা হবে।[৪৪]

---

৪১. আল-কুরআন, ০২ : ২০৮
৪২. আল-কুরআন, ০৮ : ৬১
৪৩. আল-কুরআন, ০৪ : ১২৮
৪৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০

এমনিভাবে মুমিনদের দুটি দল যদি বিরোধিতায় লিপ্ত হয় বা যুদ্ধ শুরু করে তাহলে অবশিষ্ট উম্মাহর দায়িত্ব হলো তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া। এমনকি প্রয়োজন হলে সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাকে মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

মুমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। আর তাদের এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ নিশ্চয় সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৪৫]

ইসলামের এ সকল আদেশ ও বিধানের পরম লক্ষ্যই হলো শান্তি রক্ষা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যেন মানুষ পরম শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে। ইসলামের এ লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের মধ্যে, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেও নিবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের ও যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতা সৃষ্টি করে ফেলেছো তাদের মধ্যে ভালোবাসা সঞ্চার করে দেবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত শক্তিমান, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৪৬]

বস্তুত ইসলাম মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সচেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ স. এ বিধানকে বাস্তবে অনুসরণ করেছেন এবং সমস্ত কাজ আল্লাহ্র দেখিয়ে দেয়া পথ ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেছেন। মক্কা বিজয়কালে তিনি যে পরম মানবতাবাদীর ভূমিকা রেখেছেন তা চিরকালের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি সেদিন সা'আদ বিন উবাদা রা.-এর হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। সা'আদ রা. পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে আবূ সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বললেন,

يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تُسْتَحَلُّ الحُرْمَة، اليوم أذل الله قريشاً

হে আবূ সুফিয়ান! আজকে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের দিন। আজ সকল হারাম হালাল হওয়ার দিন। আজ আল্লাহ কুরায়শদের লাঞ্ছিত করেছেন।

---

৪৫. আল-কুরআন, ৪৯ : ০৯

৪৬. আল-কুরআন, ৬০ : ০৭

রাসূলুল্লাহ স. কাছেই ছিলেন। এ কথা শুনে তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন,

اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا

না, আজকের দিন ক্ষমা ও দয়ার দিন। আজ আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে মর্যাদান্বিত করেছেন, আজ আল্লাহ কুরায়শদেরকে সম্মানিত করেছেন।[৪৭]

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী স. এর উদ্যোগের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হুদায়বিয়া সন্ধি। বাহ্যিকভাবে পরাজয়মূলক এ সন্ধি তিনি শান্তি রক্ষার জন্যই স্বাক্ষর করেছিলেন। এমনকি সন্ধি স্বাক্ষরের সময় কুরায়শদের দাবি অনুসারে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ বাদ দিয়ে তিনি শুধু 'মুহাম্মাদ' লেখার ব্যাপারেও কোনো আপত্তি করেননি।[৪৮]

কুরআন মাজীদের এ সকল ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শ অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্র তার বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য স্থির করবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ। কখনো যদি যুদ্ধ করতে হয় বা কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তারও লক্ষ্য হবে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৩. কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতি

ইসলামে কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, রাষ্ট্রদূত ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের একটা বিশেষ স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে একটা বিশেষ সর্তকতা ও সংরক্ষণতা। ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের পক্ষে এ রাষ্ট্রের আদর্শ পরিপন্থী মত প্রকাশের স্বাধীনতাও থাকবে। কেউ যদি এমন করে তাহলে তাকে কোনো শাস্তি দেয়া বা বহিষ্কার করা যাবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়া হলে আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

মিথ্যা নুবুয়তের দাবীদার মুসায়লামা ইবন হাবীব (আল-কাযযাব) রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে তার দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। প্রতিনিধিরা মুসায়লামার যে চিঠিটি বহন করে নিয়ে আসে তার ভাষ্য হলো,

مِنْ مُسَيْلِمَةَ رَسُول اللّه إِلَى مُحَمَّد رَسُول اللّه : سَلامٌ عَلَيْك ؛ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْت فِي الأَمْرِ مَعَك ، وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الأَرْضِ وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ

আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। পর বক্তব্য এই যে, আমি নুবুয়তে আপনার অংশীদার। কাজেই রাজ্যের অর্ধেক আমাদের, অর্ধেক কুরায়শদের। তবে কুরায়শরা একটি সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

---

৪৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল 'ইবাদ*, খ. ৫, পৃ. ২২০

৪৮. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং-৩১৮৭; হাদীসটির সনদ হাসান।

এ পত্রের যারা বাহক রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বলেন, "তোমরা কী বলো?" তারা বললো, তিনি যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি। রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

أَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

শোন, দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হতো, তবে আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

এরপর তিনি মুসায়লামাকে লিখলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى . أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে ঘোর মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। সালাম তার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। পর বক্তব্য এই যে, রাজ্য তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।[৪১]

এভাবে কূটনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার রক্ষা এবং কূটনীতিবিদদের সম্মান জানানোর বিধান রেখে ইসলামী রাষ্ট্র পররাষ্ট্রের সাথে সহাবস্থানের সুন্দর প্রেক্ষিত রচনা করবে।

৪. একক ও পারস্পারিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি

যে কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির সাথে পারস্পরিক চুক্তিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন– একপক্ষীয় চুক্তি ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে এ ধরনের চুক্তির অস্তিত্ব আছে।

ক) একক চুক্তি : একপক্ষীয় চুক্তি অত্যন্ত সরল ও সহজ চুক্তি। একটি রাষ্ট্র কতগুলো নির্দিষ্ট ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে অপর একটি রাষ্ট্র বা স্বাধীন শক্তির সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে এবং স্থাপিত সম্পর্ক রক্ষা করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। এক পাক্ষিক চুক্তি এ প্রয়োজনেরই ফলশ্রুতি। এ জাতীয় চুক্তির অর্থ হলো চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়া, তার সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী তা প্রমাণ করা, তার উপর কোনো ধরনের আগ্রাসন করা হবে না তার ওয়াদা করা, তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না সে প্রতিশ্রুতি দেয়া। ইসলামে এমন চুক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ স. যখন তাবূক পৌঁছলেন, তখন আয়লা অধিপতি ইউহান্না ইবন রু'বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে সন্ধির প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ স. তার

---

৪১. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম মুআফিরী, *সীরাতুন নবী স.*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭২

সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। ইউহান্না জিযিয়া কর আদায় করলো। জারবা ও আযরুহ্‌বাসীরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে জিযিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ স. তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত আছে। তিনি ইউহান্না ইবন রু'বাকে যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ:

> بِسْمِ اللّٰه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذه أَمَنَةٌ منْ اللّٰه ، مُحَمَّد النَّبِيّ رَسُول اللّٰه لِيُحَنَّةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ ، سُفُنُهُمْ وَسَيَّارَتُهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللّٰه وَذِمَّةُ مُحَمَّد النَّبِيّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ ، وَأَهْلِ الْبَحْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا ، فَإِنَّهُ لا يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِه . وَإِنَّهُ طَيِّبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لا يَحِلّ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلا طَرِيقًا يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرّ أَوْ بَحْرٍ
>
> দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল, নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে ইউহান্না ইবন রু'বা ও আয়লাবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তাদের জল ও স্থলের জাহাজ ও যানবাহনের ব্যাপারে এ নিরাপত্তা প্রযোজ্য। তাদের জন্য আল্লাহ্ ও নবী মুহাম্মদের যিম্মাদারী সাব্যস্ত হলো। শাম, ইয়ামান ও সমুদ্র দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে থাকবে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কোনো অঘটন ঘটালে তার অর্থ-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তা দখল করবে, তার তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তারা যে কোনো পানি ব্যবহার করতে চাইবে এবং জল-স্থলের যে কোনো পথে যাতায়াত করবে, তাতে তাদেরকে বাধা প্রদান করার অবকাশ থাকবে না।[৫০]

এ নিরাপত্তা পত্রে রাসূলুল্লাহ্ স. চুক্তিবদ্ধ লোকদের জন্য সব সময় ও সকল অবস্থায় পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দিলেন। তাদের বেঁচে থাকার ও জীবন যাপনের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিলেন। তাদের নিকট থেকে কোনো জওয়াবী প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি গ্রহণ না করেই তিনি তাদের চলাচলের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন।

খ) দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি : এ ধরনের চুক্তি দু রকম হতে পারে। প্রথমত তাতে উভয় পক্ষই কতিপয় নেতিবাচক শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়। যেমন উভয় পক্ষ এ ওয়াদা করলো যে, তাদের কোনো পক্ষই অপর পক্ষের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করবে না, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত কখনো এমনও হয় যে, উভয় পক্ষই কতিপয় ইতিবাচক বিষয়কে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেয়। যেমন পারস্পরিক ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্য, সংস্কৃতি বিনিময় ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ্ স. এর বৈদেশিক নীতিতে এ দু'রকম পারস্পরিক চুক্তিরই দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে দ্বি-পাক্ষিক বা পারস্পরিক চুক্তির বিধিব্যবস্থা থাকবে।

---

৫০. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৪

৫. বিজিত এলাকা শাসননীতি

প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যখন কোনো দেশ অন্য কোনো দেশ জয় করে তখন বিজয়ী দেশ বিজিত দেশে ধ্বংস, হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতনসহ যে কোনো ধরনের অন্যায় অত্যাচার চালাতে দ্বিধা করে না। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

> ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾
> সে (সাবার রাণী) বলল, 'রাজা–বাদশাহরা যখন কোন এলাকা দখল করে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানকার মান্যগণ্য লোকদের অপদস্থ করে। এরাও এমন আচরণই করবে।[৫১]

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করতে পারে না। নবী স. এবং খুলাফায়ে রাশিদীন যখন কোনো উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন, তখন অত্যন্ত তাকীদ দিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন প্রথম খলীফা আবূ বাকর সিদ্দীক রা. ৬৩২ হিজরী সালে রাসূলুল্লাহ স.-এর ওফাতের ১৯ দিন পরে উসামা রা.-এর নেতৃত্বে শাম অভিযানে সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রাক্কালে তাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত মূল্যবান দশটি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

> يا أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله أفناكم الله بالطعن والطاعون
>
> হে লোক সকল, তোমরা একটু থামো। আমি তোমাদেরকে দশটি অসিয়্যাত করবো। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। ১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং গানীমাতের মালে খিয়ানাত করবে না। ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। ৩. শত্রুদের হাত পা কেটে বিকৃত করবে না। ৪. শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। ৫. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ৬. কোনো ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৭. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাবার প্রয়োজন ছাড়া যাবহ করবে না। ৮. যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ লোকের সাক্ষাৎ হবে, যারা তাদের জীবনকে ইবাদাতখানার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। ৯. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, যারা তোমাদের জন্য বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসবে, যখন তোমরা ঐ খাবার খাবে,

---

৫১. আল-কুরআন, ২৭ : ৩৪

> তখন অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। ১০. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাত হবে, যারা নিজেদের মাথার মধ্যাংশকে পাখির বাসার ন্যায় পরিণত করে এবং তার চতুষ্পার্শ্বে পাগড়ির মতো কাপড় ফেলে রাখে, তাদেরকে তোমরা তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। যাও, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুদের বর্শা ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন।[৫২]

মুসলিম বাহিনী এ আদেশ পূর্ণভাবে পালন করেছেন। এ জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিনী যখন কোনো জনপদ দখল করেছে, জনপদের অধিবাসীরা হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কোথাও যুদ্ধ ছাড়া এক ফোঁটা রক্তপাতের ঘটনা ঘটানো হয়নি। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্র বিজিত এলাকায় ইসলাম সম্মত শাসন প্রবর্তন করবে। কাউকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করবে না। যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে স্বাগত জানাবে। যারা করবে না তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে কোনো অমুসলিম এমনকি কোনো মুসলিমও যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেও এ রাষ্ট্র কোনো রকমের উদারতা বা দয়া দেখাবে না।

উপসংহার

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র এক আদর্শিক বিশ্বরাষ্ট্র। এর বৈদেশিক নীতি এই আদর্শের ভিত্তিতেই প্রণীত হয়। এ কারণে ইসলামী রাষ্ট্র পরমত সহিষ্ণুতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সর্বাধিক কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে এর বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। কারণ মানুষকে শাসন করা এ রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়। এর লক্ষ্য মানুষের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা। ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিও এ লক্ষ্যেই প্রণীত হয়। তাই একুশ শতকের বিশ্বায়নের এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আধুনিক যে কোনো কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুসরণীয় আদর্শে পরিণত হতে পারে, চাই রাষ্ট্রটি মুসলিম বা অমুসলিম, ধর্মভিত্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষ যে ধরনের রাষ্ট্রই হোক না কেন। মনে রাখতে হবে, ইসলামের নীতি ও রাসূলুল্লাহ স. এর আদর্শ সমগ্র মানবতার জন্য এবং সকল যুগের জন্য এসেছে।

উল্লেখ্য যে, কোন মুসলিম দেশের অনুসৃত বৈদেশিক নীতি দেখে ইসলামের বৈদেশিক নীতি অনুমান করা ঠিক নয়; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আদর্শ দেখে ইসলামের বৈদেশিক নীতি জানতে হবে।

---

৫২. ইমাম আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৬; বিস্তারিত দেখুন: ড. আহমদ আলী, *খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩-৪১০

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতির ক্ষেত্রে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান*

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলামী আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হাদীস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বর্তমান সময়ে এসে পৌছেছে। এই পথ-পরিক্রমায় হাদীস কেন্দ্রিক একাধিক জ্ঞানের শাখার গোড়াপত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. এর যুগ থেকেই হাদীসের সনদ যাচাইয়ের ধারা চালু হলেও কালক্রমে জাল-যঈফসহ অসংখ্য অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা হাদীসের নামে বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পায়। এসব অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই করে এর হুকুম নির্ণয় করার কষ্টসাধ্য কাজে পূর্ববর্তী যুগসমূহে বহু খ্যাতনামা ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস-মুফাসসির-ফকীহ ও উসূলবিদ প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদেরই ধারাবাহিকতায় শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ও অনন্য ব্যক্তিত্ব। এ মহান মনীষী তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় হাদীস বিজ্ঞানের খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। হাদীস বিজ্ঞান অধ্যয়ন, শিক্ষা দান, গবেষণা ও লেখালেখিই ছিল তাঁর জীবনের প্রধানতম ব্রত। তিনি তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের জগতে যে অবদান রেখে গেছেন, তা সত্যিই অনবদ্য। শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের উপর বহুমাত্রিক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি সনদের মান বিচার-বিশ্লেষণ করে সহীহ ও যঈফ হাদীসের পৃথক সংকলন রচনা করেন। বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হাদীসসমূহের সনদ যাচাই-বাছাই করে সহীহ ও যঈফ হাদীস আলাদা করেন। তিনি হাদীস, ফিকহ ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের তাখরীজ-তা'লীক করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নে মনোনিবেশ করেন। এ কাজ সম্পাদনে শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক রচিত পূর্বতন গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থাদির পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন করেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। সেইসাথে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনে কতিপয় মৌলিক নীতিমালা উপস্থাপন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ সব বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হবে। যার মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নে শায়খ আল-আলবানী রহ.-র অবস্থান ও অবদান পরিস্ফুটিত হবে।*]

---

* সহকারী অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন বিভাগ (ইসলাম শিক্ষা), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকনগর, ঢাকা।

ভূমিকা

হাদীস বিজ্ঞানের সব কটি শাখা-প্রশাখায় শায়খ আল-আলবানী রহ.-র সরব বিচরণ লক্ষণীয়। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি চয়নেও শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-র গবেষণা ও অবদান উল্লেখযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীস বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক জ্ঞানগত শাখার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান। হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞানগত এ বিষয়টি প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হয় এবং সময়ের এগিয়ে চলার পথে এর ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। মূলত হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই, সহীহ ও যঈফ হাদীস চিহ্নিতকরণের নীতিমালা বিষয়ক জ্ঞানই হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান বলে পরিচিত। যুগ-যুগান্তরে হাদীস বিশারদগণের অবিরত প্রয়াসের মাধ্যমে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। অসংখ্য ইসলামী পণ্ডিত ও হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক লেখালেখি ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। যা হাদীস বিজ্ঞানের জ্ঞানগত জগতকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন। উপনাম আবূ আবদির রহমান। পিতার নাম নূহ। তাঁর বংশক্রম হলো নাসিরুদ্দীন ইবন নূহ নাজাতী ইবন আদম আল-আলবানী। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে আল-আলবানী বলা হয়ে থাকে। আল-আলবানী ১৩৩২ হিজরী মুতাবিক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন আলবেনিয়ার অন্তর্গত আশকুদারায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তিনি দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত হন। আর্থিক দিক দিয়ে পরিবারটি দৈন্যগ্রস্ত হলেও একটি দীনী ও রক্ষণশীল পরিবার হিসেবে তৎকালীন সমাজে পরিচিতি ছিল। তাঁর পিতা উসমানীয় খিলাফতের রাজধানী আস্তানায় (বর্তমান এটি ইস্তাম্বুল নামে পরিচিত) একটি ধর্মীয় শিক্ষালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে নিজ এলাকায় দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ফিরে আসেন। তাঁর জ্ঞান গরিমার কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অসংখ্য শিক্ষার্থী ধর্মীয় জ্ঞান লাভের আশায় তাঁর নিকট পাড়ি জমাতো। এ সময় উসমানীয় খিলাফাতের পতন এবং কামাল আতাতুর্ক-এর ক্ষমতা দখলের ফলে গোটা তুরস্কে ধর্মীয় অঙ্গনে অস্থিরতা বিরাজ করে। খোদাদ্রোহী প্রশাসন ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে বিকৃতি সাধান করে। আরবী ভাষার প্রচলন বিলুপ্ত করা হয়। মেয়েদেরকে হিজাবের পরিবর্তে অশালীন পোষাক পরিধানে প্ররোচিত করা হয়। এক কথায় সেখানে ইসলামী অনুশাসন বিলুপ্ত করা হয়। এ সময় ইসলামের উপর টিকে থাকা ঈমানদারদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার আলবেনিয়া থেকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হিজরত করে। এরই

ধারাবাহিকতায় শায়খ আলবানীর পিতা পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন এবং দামিস্কে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন।[১]

আলবানীর পিতা যখন সিরিয়ায় হিজরত করেন তখন বালক আলবানীর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। এরপর পিতা তাঁকে জামিয়াতুল ইস'আফ আল-খায়রিয়্যাহ মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। শায়খ আলবানী মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি স্বীয় পিতার নিকট কুরআন, তাজবীদ, নাহু, সারফ এবং ফিকহ্ শিক্ষা করেন।[২] এরপর তিনি সিরিয়ার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০ বছর বয়সে হাদীস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তৎকালীন মিসরের প্রথিতযশা আলিম সাইয়্যেদ রশীদ রিযার মাজাল্লাতুল মানার পড়ে হাদীস বিষয়ে জ্ঞান লাভের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন।[৩] পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানানুশীলনের অদম্য স্পৃহা তাঁকে হাদীস বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয় জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কঠোর অধ্যবসায় এবং নিরন্তর সাধনার বিনিময়ে তিনি নবী স.-এর সুন্নাহের অমিয় সুধা পান করেন। সুন্নাহর এমন কোন দিক নেই, যা তিনি উপলব্ধি করেননি। সুন্নাহের লালন ও কর্ষণে তিনি ব্যয় করেছেন তার জীবনের প্রতিটি সময় ও মুহূর্ত। ফলে তিনি আধুনিক বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুহাদ্দিস হিসেবে আবির্ভূত হন। সমকালীন সকল মুহাদ্দিস তাঁর হাদীসে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। অবশেষে সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন বায রহ. তাঁর সম্পর্কে এ ঘোষণা দেন যে,

لا أعلم تحت الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر الدين في علم الحديث

> বর্তমান যুগে এই নভোমণ্ডলের নিচে ইলমুল হাদীসে আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।[৪]

শায়খ আলবানী ছিলেন একজন উঁচুমানের হাদীস বিজ্ঞানী। তাঁর হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ প্রক্রিয়া পূর্বসূরি মুহাদ্দিসগণের অনুসৃত প্রক্রিয়া থেকে আলাদা নয়। এ যুগেও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত। সুনানু নাসাঈর বিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খ মুহাম্মাদ আলী আদম আল-আছিউবী এ প্রসঙ্গে বলেন,

---

১. ইবরাহীম মুহাম্মদ আলী, *মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী*, দামিস্ক : দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রী., পৃ. ১৬-২১; উদ্ধৃত, ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১৮২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪০১; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৪. আবদুল কাদির জুনায়দ, *আল-আলবানী আল-ইমাম*, পৃ. ৬-৭; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

وله اليد الطولى في معرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتشهد بذالك كتبه القيمة فقل من يدانيه في هذا العصر الذي ساد فيه الجهل بهذا العلم الشريف

হাদীসের সহীহ ও যঈফ নিরূপণে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থাবলি এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। এ মহান শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রাবল্যের এ যুগে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি কমই রয়েছেন।[৫]

আল-আলবানী সহীহ হাদীস নিরূপণের জন্য রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। প্রতিদিন তিনি ৮ ঘণ্টা যাহিরিয়্যাহ লাইব্রেরিতে হাদীস গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন। কোন কোন দিন এমনই হয়েছে যে, লাইব্রেরির কর্মকর্তাগণ লাইব্রেরি বন্ধ করে চলে গেছেন আর তিনি ভিতরেই রয়ে গেছেন। তিনি সারা রাত হাদীসের গ্রন্থগুলো নিয়ে গবেষণায় কাটিয়েছেন। লাইব্রেরি থেকে বাড়িতে ফিরে এসে অবশিষ্ট ১২ ঘণ্টার মধ্যে শুধু খাওয়া ও সালাত আদায় ব্যতীত বাকী সময় অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি সুনানে আরবা'আর হাদীসসমূহ যাচাই করে কোনগুলো সহীহ এবং কোনগুলো দুর্বল ও মাওযূ তা আলাদা করে স্বতন্ত্র সুনান গ্রন্থের রূপ দেন। তিনি নিম্নলিখিতভাবে সুনানগুলোকে ভাগ করেন :

সহীহ সুনানে ইবন মাজাহ (২ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে ইবন মাজাহ (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে আবী দাউদ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে আবী দাউদ (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে তিরমিযী (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে তিরমিযী (১ খণ্ডে সমাপ্ত), সহীহ সুনানে নাসাঈ (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), য'ঈফ সুনানে নাসাঈ (১ খণ্ডে সমাপ্ত)। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি ছাড়াও তিনি হাদীস বিষয়ে সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ্, সিলসিলাতুল আহাদীসিয য'ঈফাহ্, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, সহীহ আল-জামিউস সাগীর ও যঈফ আল-জামিউস সাগীর ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।[৬] তিনি ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ সালে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে অনবদ্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়িত পূর্বতন গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞান তথা সহীহ্ হাদীস বাছাই ও এগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রায় শতাধিক শাখা প্রশাখার ইলম বা জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে।[৭] এ সকল বিষয়ে কখন পূর্ণাঙ্গ অবয়বে গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা বলা কঠিন। হিজরী

---

৫. আশ-শায়বানী, *হায়াতুল আলবানী*, খ. ১, পৃ. ৪৮; উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪

৬. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

৭. ড. আ. খ. ম. ওয়ালী উল্লাহ, হাদীসের পরিভাষা ও মৌলনীতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি : একটি সমীক্ষা, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, কুষ্টিয়া, খ. ৭, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৮ খ্রী., পৃ. ৬৯

দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইমাম শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি.) রচিত 'আর-রিসালাহ' (الرسالة) গ্রন্থে সুন্নাহ তথা হাদীস গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে কতিপয় মূলনীতি আলোচিত হলেও হাদীস-মৌলনীতি বিষয়ে তা পৃথক গ্রন্থে রূপ পরিগ্রহণ করেনি। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে 'উসূলুস সুন্নাহ' (أصول السنة) ও 'মাযাহিবুল মুহাদ্দিসীন' (مذاهب المحدثين) শীর্ষক দুটো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ পর্বে হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইবন হারুন ইবন রাওহ আল-বারদীজী (মৃ. ৩০১ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক রচিত কতিপয় গ্রন্থ সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মা'রিফাতুল মুত্তাসিল ওয়াল মুরসাল ওয়াল মাকতূ' ওয়া বায়ানুত তুরুক্ব আস-সহীহাহ' (معرفة المتصل والمرسل والمقطوع وبيان الطرق الصحيحة) ও 'মা'রিফাতু 'উলূমিল হাদীস' (معرفة علوم الحديث) এ গ্রন্থ দুটোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ গ্রন্থগুলো সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য-উপাত্তের সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৮] ইবন হাজার আল-আসকালানীর (মৃ. ৮৫২ হি.) মতে, হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখায় সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ক্বাযী আবূ মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান বিন খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী (মৃ. ৩৬০ হি.)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়াল ওয়াঈ' (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى)। তবে গ্রন্থটিতে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[৯]

পরবর্তীতে হাকিম নাইসাপুরী (মৃ. ৪০৫ হি.) এ বিষয়ে 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস (معرفة علوم الحديث) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু তিনিও এটি পরিমার্জন ও পরিসম্পাদন করতে পারেননি। এমনিভাবে আল-খতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক 'আল-কিফায়াতু ফি 'ইলমির রিওয়ায়াহ' (الكفاية في علم الرواية) এবং ক্বাযী ইয়ায (মৃ. ৫৪৪ হি.) 'আল-ইলমা' ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়ায়াতি ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'' (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) নামে স্বতন্ত্র দুটো গ্রন্থ রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হিজরী সপ্তম শতকে তকী উদ্দীন ইবনুস সালাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়িত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহের পরিমার্জন, সংক্ষেপণ ও সংযোজন করে

---

৮. ড. আজ্জাজ আল-খতীব, *উসূলুল হাদীস: উলূমুহু ওয়া মুসত্বলাহুহু*, কায়রো : দারুল ফিকর, ১৪০১ হি./ ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ৪৫৩; ড. আ. খ. ম. ওয়ালী উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১

৯. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *নুযহাতিন নাযারি শরহু নুখবাতিল ফিকরি ফী মুস্তলাহি আহলিল আছার*, দামিশক : মুআস্সাসাতু ওয়া মাকতাবাতুল খাফিকীন, ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খ্রি., পৃ. ১৫-১৬

একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম রাখেন 'উলূমুল হাদীস' (علوم الحديث)। এ গ্রন্থটি 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' (مقدمة ابن الصلاح) নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে যাঁরাই হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের সকলেই অনেকাংশে এ গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছেন। এ গ্রন্থটির পুনর্বিন্যাস, সংক্ষেপণ ও সংযোজন করে আল্লামা ইবন কাছীর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)।

এমনিভাবে ইবন হাজার আল-আসকালানী 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' অনুসরণ করে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম 'নুখবাতুল ফিকর'। ইবন হাজার আল-আসকালানী নিজেই এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম রাখেন, 'নুযহাতুন নাযারি শরহু নুখবাতিল ফিকরি ফী মুসত্বলাহিল আছারি' (نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر)। ইলম হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে এ দুটো গ্রন্থকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ দুটো গ্রন্থই যেন হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে পূববর্তী হাদীস বিশারদগণের চিন্তা-চেতনা, গবেষণা ও সাধনার ফসল বা সার সংক্ষেপ। শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী এ দুটো গ্রন্থকেই নির্বাচন করেন এবং এ দুটো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যাচাই বাছাই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ইবন কাছীর রচিত গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ইখতিসারু উলূমিল হাদীস (اختصار علوم الحديث)। কিন্তু মক্কা মুকাররমা থেকে এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামুযা ছন্দ মিলাতে যেয়ে গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-বাইসুল হাসীস ইলা মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস' (الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث)। পরবর্তীতে এ নামেই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩৫৫ হিজরীতে গ্রন্থটি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যান্তর্ভুক্ত করা হয়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শায়খ আহমদ মুহাম্মদ শাকির এ বইটি পড়াতে গিয়ে তিনি এর পুরাতন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে দেখেন যে, গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)। তিনি এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে তিনি পুরাতন নামটিই ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটিতে আরো ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি করেন। এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় শায়খ আহমাদ শাকির গ্রন্থটির প্রকৃত নাম ও প্রচলিত নাম সমন্বয় করে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'আল-বাইসুল হাসীস শরহু ইখতিসারু উলূমিল হাদীস লি ইবন কাসীর' (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير) হিসেবে। এ সংস্করণটি ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খ্রী. সনে প্রকাশিত হয়।[১০]

---

১০. শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-*বাইসুল হাসীস শরহু ইখতাসারি উলূমিল হাদীস*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭০ হি./ ১৯৫১ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণে আহমদ শাকিরের ভূমিকাংশে দ্রষ্টব্য।

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র নির্বাচিত দুটো গ্রন্থের মধ্যে একটি হল, 'ইখতাসারু উলূমিল হাদীস' (اختصار علوم الحديث)। এ গ্রন্থটির সর্বশেষ সংযোজন আহমাদ শাকিরের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-বাইসুল হাসীস শরহু ইখতিসারু উলূমিল হাদীস লি ইবন কাসীর'। তিনি মূলত এ গ্রন্থটির উপরই কাজ করেন। তিনি গ্রন্থটির পুনঃযাচাই বাছাই করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা সংযোজন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এ কর্মটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত হয়। তিনি এতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করেন। আবার কোন কোন বিষয়ে শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকিরের বিরোধিতাও করেন। এটি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে শায়খ আল-আলবানীর একটি বৃহৎ গবেষণা কর্মও বটে। তাঁর নির্বাচিত দুটো গ্রন্থের মধ্যে আরেকটি হল, ইবন হাজার আল-আসকালানীর 'নুযহাতুন নযর' (نزهة النظر)। তিনি এ গ্রন্থটিরও যাচাই বাছাই করেন এবং এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করেন। অবশ্য তিনি এ গ্রন্থটির কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর এ অসমাপ্ত কাজটি পাণ্ডুলিপি আকারে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান।

ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাবলির পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন

ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল হাদীস বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো জ্ঞানগত শাখা। ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল হল হাদীস বিজ্ঞানের এমন এক জ্ঞানগত বিষয়, যার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণ বা দোষ জানা যায়, যেখানে রাবীদের গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয় বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে।[১১] অন্যদিকে হাদীসের বর্ণনাকারীদের পরিচয় সংক্রান্ত বিদ্যার নাম হল ইলমু আসমাইর রিজাল। একে ইলমু রিজালিল হাদীসও বলা হয়।[১২] এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হাদীসের সনদের মান নির্ণয়ে, সহীহ কিংবা য'ঈফ হাদীস নির্বাচনে ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল-এর জ্ঞান অতি আবশ্যক।

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. প্রথমত ইলমুল জারহি ওয়াত তাদীল ও ইলমু আসমাইর রিজাল বিষয়ে লিখিত কতিপয় গ্রন্থাবলি পরিমার্জন করেন ও সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করেন। সেই সাথে নানান প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। এরূপ কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ:

এক. আল-খতীব আত-তাবরীযী (মৃ.৭৪১ হি.) রচিত 'আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল' (الإكمال في أسماء الرجال)। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ গ্রন্থটির তাহকীক করেন।

---

১১. ড. সুবহী আস-সলিহ, *উলূমূল হাদীস ওয়া মুস্তালাহাহু*, বৈরূত : দারুল মালায়ইন লিল ইলমি, ৩য় সং-১৩৮৪ হি./ ১৯৬৫ খ্রী., পৃ. ১০৯

১২. প্রাগুক্ত

দুই. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃ.৭৪৮ হি.) রচিত 'দিওয়ানুদ দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন' (ديوان الضعفاء والمتروكين)। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ গ্রন্থটির তাহকীক করেন ও টীকা সংযোজন করেন। এটি বর্তমানে পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

তিন. ইবন আবী হাতিম আর-রাযী (মৃ.৩২৭ হি.) রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীল' (كتاب الجرح و التعديل)। এ গ্রন্থটিতে যে সব রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করেন এবং এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মতামত ব্যক্ত করেন। 'কিতাবুল জারহি ওয়াত তা'দীলের' উপর ভিত্তি করে শায়খ আল-আলবানী রহ. যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তিনি তার নামকরণ করেন 'রিজালুল জারহি ওয়াত তা'দীল লি ইবন আবী হাতিম' (رجال الجرح والتعديل لابن أبي حاتم) হিসেবে। বর্তমানে গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে বহুমাত্রিক মন্তব্য ও কার্যক্রম

শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস সংকলন, প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পরিমার্জন ও টীকা সংযোজন এবং বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসসমূহের হুকুম বর্ণনা ইত্যাদি বহুমাত্রিক কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেন। ইলম হাদীসের এত সব বৃহৎ খেদমতের পাশাপাশি শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে সবিশেষ অবদান রাখবেন, এমনটি তাঁর পরিকল্পনাধীন ছিল। তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি সব কিছু হয়তো বা গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর হায়াতে সংকুলান হয়নি। যে কারণে তিনি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ ও একক গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারেননি। তবে তিনি যদি আর কিছু দিন সময় পেতেন তাহলে হয়তো বা হাদীস বিজ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য ও সারা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে একটি অনবদ্য রচনা মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিতে পারতেন। তবুও শায়খ আল-আলবানী রহ. বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে তাঁর নানান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক কয়েকটি পাণ্ডুলিপিও রচনা করেন। হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী রহ. কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম ও বহুমাত্রিক মন্তব্যের ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

এক. শায়খ আল-আলবানী রহ. বিভিন্ন গ্রন্থের পরিমার্জন, টীকা-টিপ্পনী সংযোজন, ব্যাখ্যা লিখন, হাদীস তাখরীজকরণ এবং সংক্ষেপণ ও সংশোধন করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া কতিপয় মৌলিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি এ সব গ্রন্থের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেন। এ সব ভূমিকায় তিনি হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেছেন। যেমন শায়খ সায়্যিদ সাবিক রহ. প্রণীত 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থটির তাখরীজ ও তা'লীক করে শায়খ আল-

আলবানী রহ. 'তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ' (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তার ভূমিকায় তিনি হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে রিয়াদুস সলেহীন, শরহুল আকীদাহ আত-তহাবীয়্যাহ ও ইরওয়াউল গালীল-র ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এমনিভাবে তিনি তাঁর রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-য'ঈফাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় য'ঈফ হাদীসের উপর আমল বৈধ কিনা সে প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন।

দুই. শায়খ আল-আলবানী রহ. ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে 'তায়সীরু ইনতিফা'ইল খুল্লান বি সিকাতি ইবন হিব্বান' (تيسير إنتفاع الخلان بثقات ابن حبان) গ্রন্থটির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি এ গ্রন্থটিতে ইবন হিব্বান যাদেরকে 'ছিকাহ' বলেছেন, তাদের ব্যাপারে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

তিন. ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-জাম'উ বায়না মীযানিল ই'তিদাল লিয-যাহাবী ওয়া লিসানুল মীযান লি ইবন হাজার আল-আসকালানী' (الجمع بين ميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان لإبن حجر العسقلاني)-র নাম প্রনিধাণযোগ্য। গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান।

চার. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল, শরী'আতের বিধি-বিধান চয়নে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য কি না। শায়খ আল-আলবানী রহ. এ প্রসঙ্গে এক অভূতপূর্ব আলোচনার অবতারণা করে তিনি একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি হলো, 'আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহি ফীল আকাইদ ওয়াল আহকাম' (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام)। গ্রন্থটি পেশোয়ারের 'জামা'আতুদ দা'ওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ আল-আলবানী ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯২ হিজরী সনের রজব মাসে বর্তমান স্পেনের গ্রানাডায় মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব মুসলিম স্টুডেন্টস'-র উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে খবরে ওয়াহিদ কিভাবে শরী'আতের প্রামাণ্য উৎস হতে পারে, এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এটিকেই পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে রূপ দান করেন তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ ঈদ আল-আব্বাসী।[১৩] গ্রন্থটিতে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা সুন্নাহ, হাদীস, খবর, আছার, সনদ, মতন ও

---

১৩. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বিনাফসিহি ফীল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পেশোয়ার : জামা'আতুদ দা'ওয়াহ ইলাল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, তা. বি., পৃ. ৯

হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪] এর পর ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহর অবস্থান কী এবং আকীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে কিভাবে খবরে ওয়াহিদ হুজ্জত বা প্রামাণ্য উৎস হতে পারে, সে সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া শায়খ আল-আলবানী 'দিফা' আনিল হাদীস আন-নববী ওয়াস-সীরাহ' (دفاع عن الحديث النبوى والسيرة) নামক আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি সাঈদ রমযান আলবুতী রচিত 'ফিকহুস সীরাহ' গ্রন্থে আলবুতী বিধৃত বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এসব মন্তব্য বা আলোচনা মূলত হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক আলোচনায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, উক্ত গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী ব্যবহৃত হাসান গরীব বা হাসান সহীহ পরিভাষাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ আল-আলবানী এতে হাসান গরীব এবং হাসানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন।[১৫] 'ফিকহুস সীরাহ' গ্রন্থে উল্লেখিত ইবনুস সালাহ-র একটি মন্তব্য হল, হাদীস শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ হলো হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়া। শায়খ আল-আলবানী এ প্রসঙ্গে বলেন, কোন কোন সময় এ অবস্থায়ও হাদীস শক্তিশালী হয় না।[১৬] উপরন্তু হাদীসে গরীব ও হাদীসে সহীহ কিভাবে এক হতে পারে, মুহাদ্দিসগণ 'লাহু মানাকীর' বললে এর হুকুম কী[১৭] ইত্যাকার বহু বিষয়ে গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

পাঁচ. অধিকন্তু শায়খ আল-আলবানী রহ. তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের নানান প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। যেমন শায়খ আল-আলবানী রচিত 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ', 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-য'ঈফা' ও 'আহকামুল জানায়িয' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য ও আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। এসব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাদীসকে হাসান বলার অর্থ,[১৮] মতনের দিক থেকে হাদীসটি মাওযূ- ইমাম ইবন তাইমিয়্যার এমন বক্তব্যের মর্মার্থ,[১৯] ইমাম আয-যাহাবীর কথা 'হাদীস ফীহি মানাকীর' (حديث فيه مناكير), এবং 'মুনকারুল হাদীস'

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২০

১৫. আল-আলবানী, *দিফা'উ আনিল হাদীছিন নববী*, দামিশক : মাকতাবাতুল খাফিকীন, ১৪০৩ হি., পৃ. ৬৬

১৬. আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৭. আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৮. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আদ-দ'ঈফাহ ওয়াল মওযু'আহ ওয়া আসারুহা আস-সাইয়্যি' ফীল উম্মাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্ নাশরি ওয়াত্ তাওযী', দ্বিতীয় সং; ১৪২০ হি. / ২০০০ খ্রী., খ. ১, পৃ. ৩৬

১৯. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

(منكر الحديث) এর মধ্যে কী পার্থক্য[২০] ইত্যাকার নানা বিষয়ে শায়খ আল-আলবানী আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাখরীজ করতে গিয়ে তাখরীজের পাশাপাশি এমন সব মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। যেমন 'ইরওয়াউল গালীল'-এ তিনি বলেন: "তাদলীসকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে বলে আমি শুনেছি।"[২১] আরো উল্লেখ্য, রাফউল আসতার (رفع الأستار) গ্রন্থের তাখরীজ করতে গিয়ে শায়খ আল-আলবানী ইমাম হাসান আল-বসরী রহ.-র মুরসাল হাদীস সম্পর্কে চমৎকার এক আলোচনার অবতারণা করেন।[২২] যা মূলত হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখার অংশ বিশেষ।

হাদীসের হুকুম বর্ণনায় শায়খ আল-আলবানীর ব্যবহৃত পরিভাষা

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র হাদীস সংকলন ও তাখরীজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কোন একটি হাদীসের সনদের মান বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে শুরুতেই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাধ্যমে হাদীসটির সনদগত অবস্থান ও হাদীসের মান বিধৃত করেন। যেমন হাদীসটি সহীহ হলে শুরুতেই 'সহীহ', আর হাদীসটি য'ঈফ হলে শুরুতেই 'য'ঈফ' বলে মন্তব্য করেন। ফলে পাঠকগণ সহজেই হাদীসটির মানগত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এটি সাধারণ পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী একটি পদ্ধতি- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। শায়খ আল-আলবানী রহ. নিজেই বলেন: "আমার একান্ত আগ্রহ হলো, পাঠককে যথা সম্ভব সহজ পদ্ধতিতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট বাক্যে হাদীসের মান সম্পর্কে অবহিত করা।"[২৩] হাদীসের হুকুম বর্ণনায় ইতঃপূর্বে কাউকে এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়নি।

---

২০. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ ওয়া শাইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা,* রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত্ তাওযী, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রী., খ. ২, পৃ. ১৩

২১. المدلس لايقبل حديثه حتى يصرح بالسماع -দ্র. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল,* বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সং. ১৪০৫ হি. /১৯৮৫ খ্রী., ১ খ., পৃ. ৮৭

২২. মুহাম্মদ ইবন 'আলী আস-সনা'আনী, *রাফ'উল আসতার লি ইবতালি আদিল্লাতিল কায়িলীনা বি ফানাইন নার,* তাহকীক ও তা'লীক : শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০১ হি., পৃ. ৬৬

২৩. رغبتنا في إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة -দ্র. ইবনু আবিল 'ইয আল-হানাফী, *শরহুল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ,* তাহকীক ও তাখরীজ : শায়খ আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি./ ১৯৮৪ খ্রি., শায়খ আল-আলবানী কর্তৃক মুকাদ্দিমা, পৃ. ২৫

তাছাড়া হাদীসের হুকুম বর্ণনায় শায়খ আল-আলবানী রহ. সূক্ষ্ম ও বৈচিত্রময় পরিভাষা ব্যবহার করেন। শায়খ আল-আলবানী রহ. 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফা'তে হাদীসের হুকুম বর্ণনায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ:

এক. باطل -হাদীসটি বাতিল। যথা হাদীস নং ১, ২, ২৯।

দুই. موضوع-হাদীসটি জাল বা উৎপ্রেক্ষিত তথা বানোয়াট। যেমন হাদীস নং- ১০, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৮, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৯।

তিন. ضعيف -হাদীসটি দুর্বল। যেমন হাদীস নং- ১১, ১৩, ২৩, ২৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫১, ৫২, ৬৪, ৬৫।

চার. ضعيف جدا -হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। যেমন হাদীস নং- ১৪, ৩৭।

পাঁচ. ضعيف لا أصل له -হাদীসটি দুর্বল, এটির কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৪, ৭, ৯, ২১, ২২, ৩০, ৩১, ৪৮, ৫৩, ৫৭, ৬৬, ৬৭, ৬৮।

ছয়. لا أصل له بهذا اللفظ -এ শব্দে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং-৩৫।

সাত. لا أصل له في المرفوع-মারফূ হিসেবে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।[২৪] যেমন হাদীস নং-১৫।

আট. موضوع بهذا اللفظ -হাদীসটির এই শব্দে (বা বাক্যে) বানোয়াট। যেমন হাদীস নং-৫।

নয়. ليس بحديث -এটি হাদীস নয়। যেমন হাদীস নং-৩।

দশ. منكر لا أصل له -হাদীসটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৩৪, ৬০৯।

এগার. لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم -এটি নবী স. হতে বর্ণিত, এ কথার কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৩৩।

বার. لايصح -হাদীসটি সহীহ্ নয়। যেমন হাদীস নং- ৪১।

তের. منكر -হাদীসটি মুনকার। যেমন হাদীস নং- ৬৩।

চৌদ্দ. باطل لا أصل له -হাদীসটি বাতিল, এটির কোন ভিত্তি নেই।

পনের. لا أعلم له أصلا -এর কোন ভিত্তি সম্পর্কে আমার জানা নেই। যেমন হাদীস নং- ৬।

ষোল. لا أصل له مرفوعا-মরফূ হিসেবে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৮, ৫৩৩, ৫৪৬।

সতের. باطل بهذا اللفظ -এ শব্দে হাদীসটি বাতিল। যেমন হাদীস নং- ৫০৮।

আঠার. منكر بهذا التمام -এভাবে শেষ হওয়ায় হাদীসটি মুনকার। যেমন হাদীস নং- ৫৫৩।

উনিশ. لا أصل له فيما أعلم -আমার জানা মতে এর কোন ভিত্তি নেই। যেমন হাদীস নং- ৫৫৭।

---

২৪. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যঈফাহ,* খ. ১, পৃ. ৩৮৩

উপর্যুক্ত পরিভাষাগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু পরিভাষা তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই পরিভাষাগুলো তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন, এমন নয়। তাঁর পূর্বে বহু আলিম এরকম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

এমনিভাবে 'সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহা'তে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় সহীহ, হাসান, হাসান সহীহুন লি গায়রিহি, হাসান লি যাতিহি, সহীহ্ লি গায়রিহি, হাসান লি গায়রিহি প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আর 'শরহুল আকীদাহ আত-ত্বাহাবিয়্যাহ'-র হাদীস তাখরীজ করতে গিয়ে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবীর[২৫] অনুকরণে তিনি যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা হলো সহীহ, সহীহ মুত্তাফাকুন আলাইহি, সহীহ রাওয়াহুল বুখারী, সহীহ রাওয়াহু মুসলিম,[২৬] লা আ'রিফুহু (لا أعرفه), লাম আ'রিফুহু (لم أعرفه), সহীহুল ইসনাদ ইত্যাদি। শায়খ আল-আলবানী হাদীছের মানগত তারতম্যের কারণে হাদীছের হুকুম বর্ণনায় নানা রকম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ সব বৈচিত্রময় পরিভাষার ব্যবহার মূলত শায়খ আল-আলবানীর সূক্ষ্ম চিন্তার ফসল । আর বাস্তবতা হলো, তাঁর ব্যবহৃত সব কটি পরিভাষাই স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। যেমন শায়খ আল-আলবানী হাদীছের হুকুম বর্ণনায় কখনো বা 'সহীহ' এবং 'সহীহুল ইসনাদ' এ দুটো পরিভাষা ব্যবহার করেন। এ দুটো পরিভাষার বৈচিত্রের রহস্য হলো, 'সহীহ' মানে হাদীসটি সহীহ। কিন্তু 'সহীহুল ইসনাদ' মানে হাদীসটি সনদগত সহীহ হলেও মতনের দিক বিবেচনায় হাদীসটি সেই স্তরে নেই। আবার কখনো বা যঈফ এবং যঈফুল ইসনাদ পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এই বৈচিত্রের রহস্য হলো, 'য'ঈফ' মানে হাদীসটি য'ঈফ। তবে 'যঈফুল ইসনাদ' মানে হাদীসটি সনদগত দুর্বল হলেও মতনের দিক থেকে তা দুর্বল নাও হতে পারে। তবে তাঁর পূর্বে অনেকেই যেমন ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরে এসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের নীতিমালা প্রণয়ন

শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। যার আলোকে কোন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য তা সহজেই নির্ণয় করা যাবে। উল্লেখ্য যে, তিনি নতুনভাবে কোন মূলনীতি প্রণয়ন না করে

---

২৫. হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবী হাদীসের হুকুম বর্ণনায় যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তা হলো সহীহ মুত্তাফাকুন 'আলা সিহহাতিহি, সহীহুন আখরাজাহু (صحيح أخرجاه), সহীহ্ আখরাজাহু মুহাম্মদ (صحيح أخرجاه محمد)- মুহাম্মদ মানে মুহাম্মদ ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুন আখরাজাহু মুসলিম, হাসানুন আখরাজাহু মুসলিম ইত্যাদি।- দ্র. হাফিয মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাবী, *শরহুস সুন্নাহ*, তাহকীক : শুআঈব আরনাউত, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি.

২৬. ইবন আবিল ইয আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, আল-আলবানী কর্তৃক মুকাদ্দিমা, পৃ. ২২, ২৬, ২৭

পূর্ববর্তী মুহাক্কিক-মুহাদ্দিসগণ-প্রণীত বিভিন্ন মূলনীতি নিজের বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করেছেন। সেইসাথে তিনি প্রাচীনকালীন হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের কতিপয় নীতিমালা পরিমার্জনও করেছেন। নিম্নে শায়খ আল-আলবানী কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম মূলনীতি : যঈফ হাদীস আমল যোগ্য নয়।

শায়খ আল-আলবানী রহ.-র মতে, য'ঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।[২৭] আকাইদ ও আহকামের ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি ফাযায়েলে আমল, ওয়ায ও মানাকিব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না।

দ্বিতীয় মূলনীতি : সহীহ ও যঈফ হাদীস একই জায়গায় থাকা উচিত নয়

শায়খ আল-আলবানী রহ. মনে করেন, সহীহ ও যঈফ হাদীস একই অবস্থানে থাকা উচিত নয়। বরং সহীহ ও যঈফ হাদীছের পৃথক সংকলন হওয়া দরকার। যাতে পাঠক সহজেই সহীহ হাদীসের জ্ঞান আহরণ করতে পারেন এবং আমলের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পরিগ্রহণ ও যঈফ হাদীস পরিবর্জন করতে পারেন। এটি পাঠকদের জন্য নিরাপদ। আর এ কারণেই তিনি 'আস-সুনান আল-আরবা'আ'সহ অনেক হাদীস গ্রন্থকে বিভাজন করে সহীহ ও যঈফ হাদীছের পৃথক সংকলন রচনা করেছেন। এমনকি সহীহ ও যঈফ হাদীছের বিশাল আকারের পৃথক দুটো সংকলনও তিনি করেছেন। যা তাঁর এক অনবদ্য কীর্তি।

তৃতীয় মূলনীতি : খবরে আহাদ আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই হুজ্জাহ তথা প্রামাণ্য উৎস।

শায়খ আল-আলবানী রহ. মনে করেন, আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রে খবরে আহাদ হুজ্জাহ বা প্রামাণ্য উৎস। যাঁরা বলেন, আকীদার ক্ষেত্রে খবরে আহাদ প্রযোজ্য নয়; শায়খ আল-আলবানী প্রমাণ করেন তাদের এ কথার কোন ভিত্তি নেই, এরূপ কথা ইসলামে নতুন ও বিদ'আত। তাঁর মতে, আকীদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ এর উপর আমল করা ওয়াজিব, আর না করা বিদ'আত।[২৮]

চতুর্থ মূলনীতি : খবরে আহাদ শুধু ধারণা দেয় না, বরং কখনো কখনো ইয়াকীন সৃষ্টি করে।

কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, খবরে আহাদ যান্ন তথা ধারণা দিতে পারে, এটি ইয়াকীন জন্মায় না বা অকাট্য নয়। শায়খ আল-আলবানী এ মতের সাথে দ্বিমত

---

২৭. আল-আলবানী, *য'ঈফুল আদাবিল মুফরাদ*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সং, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খ্রী., পৃ. ৩২

২৮. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বি নাফসিহি ফিল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পৃ. ৫১-৫৫

পোষণ করেন। তিনি বলেন, খবরে আহাদ কখনো কখনো ইয়াকীনও সৃষ্টি করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা.-র হাদীস,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى

'রাসূলুল্লাহ স. রামাদানে ছোট-বড় ও নর-নারী নির্বিশেষে সকলের ওপর সাদাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।

শায়খ আল-আলবানী উল্লেখ করেন, এটি খবরে আহাদ। অথচ ইবনুল কায়্যিম তাঁর 'মুখতাসারু সাওয়ারিক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইবন তাইমিয়া বলেছেন, এ হাদীসটি পূর্বাপর অধিকাংশ উম্মতে মুহাম্মদীর মতে ইলম ইয়াকীন প্রদান করে।[২৯]

পঞ্চম মূলনীতি: হাদীসের উপর কিয়াসকে প্রধান্য দেয়ার নীতি ভ্রান্ত ও অবৈধ।

হাদীসের সনদে অস্পষ্টতা বা ত্রুটি থাকতে পারে। এমনটি হতেই পারে। কিন্তু হাদীস সহীহ প্রমাণিত হওয়ার পর কিয়াস বা আকলকে কোনক্রমেই প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে না।[৩০]

ষষ্ঠ মূলনীতি : মুদাল্লিস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মুদাল্লিস শব্দটি تدليس -তাদলীস শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আর এ تدليس - তাদলীস শব্দটি دلس -দালস শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো ধোঁকা দেওয়া, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন, তাদলীস তিন প্রকার।[৩১] যথা: এক. তাদলীসুল ইসনাদ (تدليس الإسناد): রাবী কর্তৃক এমন ব্যক্তির হাদীস বর্ণনা করা, যার সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে। তবে তিনি তার নিকট থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি। কিন্তু হাদীস বর্ণনার সময় এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি উক্ত শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। দুই. তাদলীসুশ শুয়ূখ (تدليس الشيوخ): রাবী কর্তৃক এমন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করা, যার নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন, তা বুঝা যায় না এবং তার মাধ্যমে উক্ত শায়খকে চেনা যায় না। তিন. তাদলীসুত তাসবীয়াহ (تدليس التسوية): মুদাল্লিস এমন হাদীস বর্ণনা করেন, যা তিনি বিশ্বস্ত শায়খ থেকে শ্রবণ করেছেন। আর ঐ বিশ্বস্ত শায়খ দূর্বল শায়খ এর কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন। অতঃপর উক্ত দূর্বল রাবী বিশ্বস্ত রাবী থেকে বর্ণনা করেন। তারপর তাদলীসকারী ব্যক্তি প্রথম বিশ্বস্ত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং দূর্বল রাবীকে বাদ দেন। অতঃপর বিশ্বস্ত শায়খ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

---

২৯. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আল-হাদীস হুজ্জাতুন বি নাফসিহি ফিল আকাইদ ওয়াল আহকাম*, পৃ. ৬৫

৩০. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

৩১. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক 'আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, রিয়াদ : দারুর রায়াহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ৩ য় সং, ১৪০৯ হি., পৃ. ১৮

অপর বিশ্বস্ত শায়খ হতে এমন শব্দ প্রয়োগে যেমন 'আন 'আন (عنعن) বা অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেন যে, মাঝখানে একজন দূর্বল রাবীর নাম বাদ পড়ে গেল, তা সহজে বুঝা যায় না। ফলে হাদীছের সনদটি নির্ভরযোগ্য সনদে পরিণত হয়। যদি নির্ভরযোগ্য কোন রাবী কর্তৃক তাদলীসের এ দোষ প্রমাণিত হয়, তাহলে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ছাড়া তা গ্রহণ করা যাবে না। আর এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ কথা।[৩২]

সপ্তম মূলনীতি : মাজহুল রাবীর হাদীস অগ্রহণীয়।
হাদীসবিদগণের মতে, মাজহুল (مجهول) হলো ঐ লোক, যিনি ইলম অর্জনে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। আলিম সমাজও তাকে চিনেন না। আর একজন মাত্র রাবীর মাধ্যমেই তার হাদীছের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৩] শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন, মাজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি মজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীসটি একদল নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয় এবং তাঁর সে হাদীসে প্রত্যাখ্যানের উপযোগী কোনো বিষয় যদি না থাকে, তাহলে সেটি গ্রহণ করা যাবে। হাফিয ইবন হাজার আল-আসক্বালানী, আল-হাফিয আল-ইরাক্বী, ইবন কাছীর প্রমূখ এমনটিই আমল করেছেন।[৩৪]

অষ্টম মূলনীতি : ইবন খুযায়মা ও ইবন হিব্বান কর্তৃক সহীহ সাব্যস্ত হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

মাজহুল রাবী থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, অধিকাংশ আলিম এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু ইবন হিব্বান সে মত গ্রহণ করেননি। বরং তিনি তার সংকলিত সহীহ ইবন হিব্বানে মাজহুল ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫] ইবন খুযায়মাও অনুরূপ করেছেন। তাই তাদের সাব্যস্তকৃত সকল সহীহ হাদীসের উপর আস্থা রাখা যাবে না।[৩৬]

নবম মূলনীতি : 'রিজালুহু রিজালুস সহীহ' এ পরিভাষা দ্বারা হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় না
হাদীস বিজ্ঞানের মূলনীতি অনুযায়ী সহীহ হাদীস তাই, যা অন্যান্য ইতিবাচক গুণাবলি থাকার পাশাপাশি শায, ইযত্বিরাব, তাদলীসসহ যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকেও মুক্ত। সুতরাং মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা রিজালুহু রিজালুস সহীহ (رجاله رجال الصحيح) অর্থাৎ রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবীদের অনুরূপ-এ বক্তব্যের মাধ্যমে হাদীসকে সহীহ বলা যাবে না। তাছাড়া এ পরিভাষাটি 'ইসনাদুহু সহীহ' (إسناده صحيح) পরিভাষার

---

৩২. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮২

সমার্থবোধক নয়। কেননা 'ইসনাদুহু সহীহ' (إسناده صحيح) এ বক্তব্য প্রমাণ করে হাদীসটির সনদ সার্বিক ত্রুটিমুক্ত। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। অন্যদিকে 'রিজালুহু রিজালুস সহীহ' (رجاله رجال الصحيح) বা 'রিজালুহু ছিকাত' (رجاله ثقات) এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রাবীগণ আদালত সম্পন্ন। কিন্তু হাদীসটি আরো অপরাপর দোষ মুক্ত কিনা, তা প্রমাণিত হয় না। তাই শায়খ আল-আলবানীর মতে, উক্ত পরিভাষা দ্বারা হাদীস সহীহ প্রমাণিত হয় না।[৩৭]

দশম মূলনীতি : ইমাম আবূ দাউদের নীরবতার উপর নির্ভর করা যাবে না।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনানু আবি দাউদ সম্পর্কে বলেন:

ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح

আমার এ কিতাবে যেখানে খুব দুর্বল হাদীস স্থান পেয়েছে, আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেখানে নীরবতা অবলম্বন করেছি, তা সালিহ হাদীস।[৩৮]

হাদীসবিদগণের মধ্যে ইমাম আবূ দাউদের ব্যবহৃত এ 'সালিহ' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একদল উলামা মত পোষণ করেন যে, 'সালিহ' অর্থ হাসান হাদীস। সুতরাং তিনি যে সেব হাদীসে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অপর একদল উলামার মতে, 'সালিহ' শব্দটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ এতে যেমন দলীল হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হাদীস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি অন্য হাদীসের সহায়ক প্রত্যয়নকারী হাদীসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এরূপ হাদীস অত্যধিক দুর্বল নয়।[৩৯] শায়খ আল-আলবানী বলেন, শেষোক্ত মতটিই সঠিক। কারণ ইমাম আবূ দাউদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, অত্যধিক দুর্বল হাদীসের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এ কথা প্রমাণ করে যে, অল্প দুর্বল হাদীসের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি।[৪০] তার মানে, তিনি যে সব হাদীসের ক্ষেত্রে নীরব, সেগুলোর মধ্যে সবক'টি হাসান নয়; বরং তন্মধ্যে দুর্বল হাদীসও রয়েছে। কাজেই এ সব হাদীসকে হাসান হাদীস হিসেবে গণ্য করে তার উপর আমল করা যাবে না।

একাদশতম মূলনীতি : 'আল-জামিউস-সগীর'-র ক্ষেত্রে ইমাম সুয়ূতীর ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নকে নির্ভুল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না ।

আল্লামা সুয়ূতী 'আল-জামিউস-সগীর' গ্রন্থে কতিপয় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন সহীহ বুঝাতে 'সোয়াদ' (ص), হাসান বুঝাতে 'হা' (ح), যঈফ

---

৩৭. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৩৮. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪০. প্রাগুক্ত

বুঝাতে 'যোয়াদ' (ض) ইত্যাদি। ইমাম সুয়ূতীর এ সব সাংকেতিক চিহ্নের ওপর দুটো কারণে নির্ভর করা যায় না। এক. গ্রন্থের বিভিন্ন অনুলিপিতে উপর্যুক্ত সাংকেতিক চিহ্নসমূহের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দুই. এটি সর্বজন বিদিত যে, ইমাম সুয়ূতী সহীহ ও যঈফ হিসেবে হাদীসের মান নির্ণয়ে নমনীয় ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর নির্বাচিত সহীহ ও হাসান হাদীস থেকে কয়েক শত হাদীস আল্লামা মুনাবী (৯৫২-১০৩১ হি.) বাদ দিয়ে দেন। এতদ্ব্যতীত এ সব হাদীসের মধ্যে জাল হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। শায়খ আল-আলবানী উক্ত গ্রন্থটিকে সহীহ ও যঈফ হিসেবে বিভাজন করে সাহীহুল জামি' ও যা'ঈফুল জামি' নামে পৃথক দুটো সংকলন রচনা করেন। যা'ঈফুল জামি'তে ৬৪৬৯ টি হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৯৮০ টি হাদীস জাল।[৪১]

দ্বাদশ মূলনীতি : 'আত-তারগীব' নামক গ্রন্থে আল্লামা মুনযিরীর নীরবতা দৃঢ়তার প্রমাণ নয়।

মূলনীতি হলো, যঈফ হাদীসের দুর্বলতার স্বরূপ ও কারণ উল্লেখ করা ছাড়া তা রিওয়ায়াত করা জায়িয নয়। এ কারণে অনেকে ধারণা করেন যে, 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে আল্লামা মুনযিরী যে সকল হাদীসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে সব হাদীস যঈফ নয়। শায়খ সাইয়িদ সাবিক্ব বহু হাদীসের ক্ষেত্রে এ রূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর এরূপ নীতি অনুসরণের মূল কারণ হলো, আল্লামা মুনযিরী স্বীয় গ্রন্থের অবতরণিকায় যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর বিস্মৃতি। উল্লেখ্য যে, আল্লামা মুনযিরী সহীহ, হাসান এবং অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় 'আন' (عن) শব্দটির ব্যবহার করেছেন। মুরসাল, মুনকাতি, মু'দাল, মুবহাম, যঈফ হাদীস বর্ণনায়ও সহীহ বা হাসান হাদীসের অনুরূপ 'আন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বটে; তবে তিনি সাথে এসব হাদীসের দুর্বলতার কারণের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।[৪২] আর মিথ্যুক, জালকারী, অভিযুক্ত, সর্বজন পরিত্যাজ্য বা দুর্বল ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা ব্যতীত কেবল (روى) বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লামা মুনযিরীর (روى) শব্দ দ্বারা বর্ণিত সকল হাদীসই দুর্বল বলে গণ্য হবে। কাজেই তাঁর এ জাতীয় হাদীসসমূহের ওপর আমল করা যাবে না।[৪৩]

ত্রয়োদশ মূলনীতি : বিবিধ সনদের মাধ্যমে হাদীস শক্তিশালী হয়।

আলিমগণের নিকট এটি প্রসিদ্ধ কথা যে, যখন কোন হাদীস বিবিধ সনদে বর্ণিত হয়, তখন তা শক্তিশালী হাদীসে পরিণত হয় এবং তা দ্বারা হুজ্জাত পেশ করা যাবে। তবে এ কথাটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি হাদীসটি কেবল রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার

---

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৪২. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৪৩. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

কারণে য'ঈফ রূপে বিবেচিত হয়। আর রাবী যদি অন্য কোন দোষে যেমন অসততা, পাপাচার ও কপটতার দোষে দোষী বা অভিযুক্ত হন, তাহলে উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যত বহুবিধ সনদেই বর্ণিত হোক না কেন, তা কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এ সূক্ষ্ম নীতিটুকু প্রাচীন ও আধুনিককালের বহু আলিম উপেক্ষা করেছেন। তাদের ধারণা হল, বিবিধ সনদে হাদীস বর্ণিত হলেই হাদীসটি শক্তিশালী হয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত।[৪৪]

চতুর্দশ মূলনীতি : কারণ উল্লেখ বিহীন যঈফ হাদীস বর্ণনা করা জায়িয নয়।

শায়খ আল-আলবানী বলেন, প্রাচীন ও আধুনিক বহু লেখক স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনে যঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ উল্লেখ করেননি। এর প্রধান কারণ হল, হাদীস সম্পর্কে না জানা, উদাসীনতা ও এ বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থ অধ্যয়নে তাদের অলসতা।[৪৫] কিন্তু শায়খ আল-আলবানীর মতে, প্রসঙ্গক্রমে কোথাও যঈফ হাদীস বর্ণনা করলে হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করতে হবে। যাতে পাঠকগণ হাদীসটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

আবু শামাহ বলেন,

> وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ بل ينبغي أن يبين أمره إن علم وإلا دخل تحت الوعيد
>
> হাদীস বিশেষজ্ঞ, উসূলবিদ ও ফকীহগণের নিকট এ ধরনের কাজ তথা কারণ উল্লেখ বিহীন যঈফ হাদীস বর্ণনা করা একান্তই ভুল ও গর্হিত কাজ। বরং যদি দুর্বলতার কারণ জানা থাকে, তা হলে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া উচিত। অন্যথায় সে এতদসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর ধমকের আওতার মধ্যে পড়বে।[৪৬]

আর এ বক্তব্য ঐ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে, যে ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করেন। আর কেনইবা হবেন না, যখন তা আহকাম ও অনুরূপ বিষয়ক হাদীসের ক্ষেত্রে

---

৪৪. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*

৪৫. আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

৪৬. রসূলুল্লাহ্ স. বলেন: مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এমন কথা বলে যা সম্পর্কে সে মনে করে যে, তা মিথ্যা, তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন।-দ্র. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, পরিচ্ছেদ : উজূবুর রিওয়ায়াহ 'আনিস ছুকাত ওয়া তারকিল কায্যাবীন, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং- ০৭

প্রযোজ্য হচ্ছে। জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে দু'দলের যে কোন একটির মধ্যে শামিল হবে।[৪৭]

এক. যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও যদি তিনি তা বর্ণনা না করেন, তাহলে তিনি মুসলিমদের সঙ্গে খেয়ানত করলেন এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন।

দুই. যদি হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি অনবহিত হন, তাহলে তিনি পাপী হবেন। কারণ বিনা 'ইলমে তিনি হাদীসকে রাসূলুল্লাহ স.-র নামের সাথে সম্পৃক্ত করলেন। এতদুদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স.-র বাণীঃ

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শ্রবণ করে, তাই (বিনা বিচারে) বর্ণনা করে।[৪৮]

সুতরাং যিনি বিনা বিচারে হাদীস বর্ণনা করবেন, তিনি রাসূলুল্লাহ স.-র প্রতি মিথ্যারোপের পাপে শামিল হবেন। কারণ তিনি যা শ্রবণ করেলেন, যাচাই-বাছাই না করে কেবল তাই বর্ণনা করলেন। অনুরূপ পাপী ঐ ব্যক্তিও হবেন, যিনি গ্রন্থ রচনায় বিনা তাহকীকে যঈফ হাদীস চয়ন করেছেন।

পঞ্চদশ মূলনীতি : ফযীলত সংক্রান্ত বিষয়েও যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেন : আলিম সমাজ ও সর্বসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য। প্রকৃতার্থে বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ অধিকাংশ আলিমের মতে, যঈফ হাদীস কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়, চাই তা ফাযায়েল সংক্রান্ত বিষয়ে হোক কিংবা আহকাম সংক্রান্ত হোক। এদের মধ্যে শায়খ কাসিম, ইবন সাইয়িদিন নাস, আবূ বকর ইবনুল আরাবী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শায়খ আল-আলবানী বলেন, এ মতটিই বিশুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি মনে করিঃ ক. যঈফ হাদীস দুর্বল ধারণার ফায়েদা দেয়। আর এরূপ ধারণার ভিত্তিতে আমল বৈধ নয়। এতে সকল উলামা একমত। সুতরাং যারা ফযীলত বিষয়ে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য মনে করেন, তাদের এর পক্ষে দলীল পেশ করা উচিৎ। খ. ফাযায়েলুল আমল একটি শরঈ বিষয়, যার আমলের পশ্চাতে ছাওয়াব রয়েছে। আর যঈফ হাদীস দ্বারা শরঈ বিধান প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এর প্রতি আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আহকাম, ফাযায়েল সবই শরীয়ত। তবে তিনটি শর্তে যঈফ হাদীসের উপর 'আমল

---

[৪৭] নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৪৮] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুকাদ্দিমাহ, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু 'আনিল হাদীসি বিকুল্লি মা সামি'আ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৭

করা যেতে পারে। এক. তা যেন জাল না হয়। দুই. 'আমলকারী যেন হাদীসটি যঈফ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হয়। তিন. 'আমলটি যেন প্রসিদ্ধি লাভ না করে।[৪৯]

ষষ্ঠদশ মূলনীতি : সহীহ্ হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব, যদিও এর উপর ইতঃপূর্বে কেউ আমল না করে থাকে।

ইমাম শাফিঈ রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ্'-র মধ্যে উল্লেখ করেন যে, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বৃদ্ধাঙ্গুলী ভাঙ্গার শাস্তি স্বরূপ পনেরটি উট প্রদানের ফয়সালা দেন। তারপর যখন আমর ইবন হাযমের লিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেল, যাতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত আঙ্গুলের বিনিময়ে দশটি করে উট ধার্য করেছেন এবং যখন খলীফা নিশ্চিত হলেন যে, এটি রসূলুল্লাহ স.-র হাদীসের পাণ্ডুলিপি এবং যখন হাদীসটি সহীহ্ প্রমাণিত হল, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ স.-র সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করলেন।

অত্র হাদীসে দু'টি দলীল বিদ্যমান : এক. হাদীস গ্রহণ করা। দুই. হাদীস সহীহ্ প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই আমল করা। যদিও ইতঃপূর্বে এর উপর আমল পরিলক্ষিত না হয়। উপর্যুক্ত দলীল হতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হল, ইমাম কর্তৃক অনুসৃত কোন কাজ যদি হাদীস পরিপন্থী প্রমাণিত হয়, তাহলে ইমামের রায় প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ স.-র হাদীস সহীহ্ প্রমাণিত হওয়াই আমলের জন্য যথেষ্ট। কেউ 'আমল করেছেন কি-না, তা দেখার প্রয়োজন নেই।[৫০]

সপ্তদশ মূলনীতি : শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক একজনের উপর অর্পিত ফয়সালা সকল মানুষের উপর অর্পিত হবে।

শায়খ আল-আলবানী রহ. বলেনঃ শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক কোন একজন লোকের উপর অর্পিত ফয়সালা সকল মানুষের উপর অর্পিত হবে কি-না এ নিয়ে 'উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। এ বিষয়ে আল্লামা আল-আলবানী রহ.-র সিদ্ধান্ত হল, শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক একজনের উপর অর্পিত ফয়সালা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারণ শরীয়ত যে ক্ষেত্রে কোন একজনের ফয়সালা ঐ একক ব্যক্তির জন্য খাস করেছেন, সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন আবী বুরদাহ্ ইবন নিয়ার রা.-এর বিনা দাঁতাল দুম্বা কুরবানীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে বলেছেন ঃ

إنه لا تجزى عن بعده

এর পরে এটা আর কারো জন্য জায়েয হবে না।

---

[৪৯] শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *তামামুল মিন্নাতি ফীত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৮

[৫০] ইমাম শাফেঈ রহ.-এর 'আর-রিসালাহ্'-এর সূত্রে নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

সুতরাং একক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্টকরণ ছাড়া আম বা সাধারণভাবে এক ব্যক্তির উপর যত বিধান অর্পিত হয়েছে তা সবার উপর অর্পিত হবে। যেমন মুস্তাহাযা রোগিনীর একজনের বিধান সকল মুস্তাহাযা বা হায়েয ওয়ালা মহিলার উপর অর্পিত হবে। ইবনু আব্বাস রা.-র সালাত আদায়ে জাবির রা. তার ডান পার্শ্বে দাঁড়ানোর একক হাদীস সকল মুসলিম নর-নারীর উপর অর্পিত হবে। যখন ইমামের সঙ্গে একাকী সালাত আদায় করবে, তখন তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হবে।[৫১]

অষ্টাদশ মূলনীতি : 'আস-সুনান আল-আরবা'আ' ও 'সুনান দারিমী'কে সহীহ বলা ভুল।

'আস-সুনান আল-আরবা'আ'কে ছয়টি সহীহ গ্রন্থ তথা 'আস-সিহাহ আস-সিত্তা'র অন্তর্গত করা হয়। আবার কেউ কেউ সুনান ইবন মাজার পরিবর্তে 'সুনান দারিমী'কে অধিক সহীহ মনে করে একে সিহাহসিত্তার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস পান।[৫২] শায়খ আল-আলবানী বলেন, ঐ সব গ্রন্থে প্রচুর যঈফ হাদীস রয়েছে। এমনকি 'সুনান ইবন মাজা'তে মওযূ হাদীসও রয়েছে। এমনিভাবে 'সুনানে দারেমীতে'ও। তাই এগুলোকে সহীহ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা শুধু ভুল নয় বরং অজ্ঞতা।[৫৩]

পরিশেষে বলা যায়, এ ধরনের অসংখ্য মূলনীতি সমপর্যায়ের বক্তব্য শায়খ আল-আলবানীর গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। যা হাদীস অধ্যয়ন, গ্রহণ ও বর্জন এবং আমলের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে, শায়খ আল-আলবানী রহ. হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক চয়নকৃত পূর্বতন গ্রন্থের ব্যাখ্যা, তাখরীজ ও তাহকীক করেন। এ বিষয়ে তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীসের হুকুম বর্ণনায় বিভিন্ন পরিভাষার ব্যবহার করেন। হাদীস মূল্যায়ন, গ্রহণ ও বর্জনের মূলনীতি প্রণয়ন করেন। শায়খ আল-আলবানীর এসব কার্যক্রম হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। সহীহ ও যঈফ হাদীস সম্পর্কে জানার পথকে করেছে সহজ-সাবলীল ও সুপ্রশস্ত। পরিশেষে বলা যায়, হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক নানান প্রসঙ্গ ও মূলনীতি উপস্থাপন করে হাদীস বিজ্ঞানের মৌলনীতি বিষয়ক জ্ঞানগত শাখায় আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ. যে অবদান রেখেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে পথ প্রদর্শক।

---

৫১. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

৫২. মওলানা মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০ খ্রি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৪

৫৩. শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *আত-তাওয়াসসুল : আনওয়া'উহু ওয়া আহকামুহু*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫ খ্রী., পৃ. ১৩১-১৩২

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪১
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৫

নাগরিক অধিকার : পরিপ্রেক্ষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ইসলাম

আব্দুল্লাহ আল মামুন*

[সারসংক্ষেপ : *মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে মানবাধিকারের ধারণাও বিকশিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগে ও সভ্যতায় মানবাধিকার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কল্যাণকামিতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষার তত্ত্বগত নিশ্চয়তা প্রদান করা হলেও পরবর্তীকালে মদীনা সনদ, ম্যাগনাকার্টা, বিল অব রাইটস, ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা, আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণাসহ বিভিন্ন সনদ ও ঘোষণার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় সকল উদ্যোগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবুও বর্তমান পৃথিবীর মানবাধিকারের নীতিগত ও আইনী কাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক উচ্চারিত পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা। এই ঘোষণার দীর্ঘ ৪৩ বছর পর ১৯৯০ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ঘোষিত ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে কায়রো ঘোষণা ঘোষিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপর্যুক্ত দুটি ঘোষণায় নাগরিক অধিকার হিসেবে বর্ণিত অধিকারসমূহকে পৃথক করে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে ১২টি নাগরিক অধিকার আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঘোষণা দুটি যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত হওয়ার কারণে অনেক অধিকারই এমন রয়েছে যে, সেগুলোর শ্রেণীবিন্যাস যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কিছু ক্ষেত্রে দুটি ঘোষণা ও কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের মধ্যে আন্তঃতুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনান্তে বুঝা যায় যে, জাতিসংঘের ঘোষণার বহু পূর্বেই ইসলাম মানবাধিকারের ঘোষণা কুরআন ও সুন্নাহয় জোরালো ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিমগণ তা ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বাস্তবায়ন করেছে। তারপরও কায়রো ঘোষণা ইসলামে মানবাধিকারের ব্যাপারে একটি অনবদ্য দলীল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।]*

মূল শব্দসমূহ

অধিকার, নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, ইসলাম, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ।

---

* শিক্ষক, পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, উত্তরা, ঢাকা।

ভূমিকা

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে নাগরিক বলে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের কাছেও নাগরিকের অধিকার রয়েছে। অন্যের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে রাষ্ট্রের বিধিমত বাধাহীন, সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সমাজের সকল ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকারসমূহই হলো নাগরিক অধিকার। সাধারণত আইনি ঘোষণা বা সাংবিধানিক বিধিমতে প্রয়োজনে আইনের রক্ষকদের দ্বারা এসব অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

আধুনিক যুগে বিশেষ করে আমেরিকার দাসপ্রথা বিলুপ্তির সময় থেকে বিশ্বব্যাপী নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলন ঐ অধিকারসমূহের নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রণীত "সিভিল রাইটস অ্যাক্ট" দেশবাসীর নাগরিক অধিকারের বাস্তব রূপ প্রদান করে এবং তা প্রয়োগের পথ উন্মুক্ত করে। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকারসমূহ ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধিবদ্ধ রয়েছে এবং এসবের প্রয়োগ উচ্চ আদালতের মাধ্যমে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোর কয়েকটি হচ্ছেঃ আইনের চোখে সবাই সমান, ধর্ম, জাতি, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থান নিয়ে কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করা, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে জনজীবনে নরনারীর সমানাধিকার, রাষ্ট্রের চাকুরিতে সমান সুযোগ, আইনের সংরক্ষণের অধিকার, ব্যক্তিজীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, বেআইনি গ্রেফতার ও আটক রাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা, চলাফেরায় স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা, সংঘ-সমিতি করার স্বাধীনতা, চিন্তা, বিচারবুদ্ধি ও বাক স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং বাসস্থানের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তা। OIC এর Cairo Declaration (কায়রো ঘোষণা) তে ২৫টি ধারা ও ৩৭টি উপধারায় ইসলামের নাগরিক অধিকারসমূহ স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে।

বর্তমানে মানবাধিকারের পোশাকধারী পশ্চিমা বিশ্ব তথা কিছু অমুসলিম মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপবাদ বারবার দিয়ে যাচ্ছে। তারা মিডিয়ায় মুসলিম সমাজের কিছু চিত্র তুলে ধরে ইসলামের নামে নানা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। অথচ মানবতার সূচনা থেকেই ইসলাম মানবকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, যা কোন ধর্ম, রাষ্ট্র, সংস্থা বা সনদ দিতে পারেনি। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা তথা অমুসলিমদের অজ্ঞতা ও কিছু মুসলিমের সীমাহীন বাড়াবাড়িই ইসলামের এ মহান আদর্শকে কলুষিত করছে। ইসলাম শুধু মানুষকেই না; অন্য সব প্রাণিকেও যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। সব জীবের অধিকার একমাত্র ইসলামই নিশ্চিত করেছে। এজন্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।[1]

---

১. আল-কুরআন, ২১ : ১০৭

ইসলাম ও পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ও প্রকারভেদ

মানবাধিকার শব্দটিকে আলাদা করলে দু'টি শব্দ পাওয়া যাবে। একটি মানব, অন্যটি অধিকার। অর্থাৎ মানবাধিকার শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে মানুষের অধিকারকে। তাহলে মানবাধিকার হলো মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারগুলোকে নিশ্চিত করা।

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের এক ধরনের অধিকার, যেটা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য। মানুষ এ অধিকার ভোগ করবে এবং চর্চা করবে। তবে এ চর্চা অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্টের কারণ হতে পারবে না। মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধিকার একই সাথে সহজাত ও আইনগত অধিকার। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম দায়িত্ব হল এসব অধিকার সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। যদিও অধিকার বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝানো হয়েছে তা এখন পর্যন্ত একটি দর্শনগত বিতর্কের বিষয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২ (চ) ধারা অনুসারে "মানবাধিকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন (Life) অধিকার (Liberty) সমতা (Equality) ও মর্যাদা (Dignity) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার।[২]

অন্যকথায়, মানবাধিকার হলো মানুষকে দেয়া এক ধরনের অধিকার, যেটা তার জন্মগত এবং অবিচ্ছেদ্য। যে ক্ষমতা সে ভোগ করবে এবং চর্চা করবে অবাধে। তবে বিষয়টি অন্যের ক্ষতিসাধন ও প্রশান্তি বিনষ্ট বর্জিত হতে হবে।[৩]

ইসলামের দৃষ্টিকোণে মানবাধিকার হলো, জীবন ধারণের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় শরী'আহ স্বীকৃত মৌলিক অধিকারসমূহ।[৪] এখানে অধিকারটি শরী'আহ স্বীকৃত হতে হবে। যেমন, কোন মুসলিম মদ বা শূকরের মাংস খেতে চাইলে তাকে সেটা থেকে বারণ করা তার অধিকারের খর্ব নয়।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights (UDHR)) ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার

---

২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ওয়েবসাইট ও মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রদিবেদন, ২০১৩, পৃ. ৫৪ থেকে সংগৃহীত। http://www.nhrc.org.bd/hr.html

৩. মো: শহীদুল ইসলাম, *মানবাধিকার তত্ত্ব-তথ্য*, ঢাকা : পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ২৭

৪. মুস্তফা আহমাদ যারকা, *আল-মাদখাল আল ফিকহীল 'আম*, দামেশ্‌ক : দারুল কলম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.,খ. ৩, পৃ. ৯-১০

লক্ষ্য নিয়ে এই সনদ ঘোষিত হয়। মানবাধিকার বিষয়টি অনেক ব্যাপক হওয়ায় এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় বলে আলোচ্য প্রবন্ধে শুধু নাগরিক অধিকার নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ, OIC এর Cairo Declaration (কায়রো ঘোষণা) ও ইসলামের বিধান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ইসলামে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

ইসলামে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. **তাওহীদে বিশ্বাস** : ইসলামে মানবাধিকারের মূল হলো তাওহীদে বিশ্বাস। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, এটাই সব অধিকার ও স্বাধীনতার মূল উৎস। কেননা আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান, মানুষ স্বাধীনই থাকুক। মানুষ হয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত বা পূজা করা কোনভাবেই বিবেকের স্বাধীনতা বলা যায় না। তাই ইসলাম মানুষের অধিকারসমূহকে সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে, এমনকি কোথাও মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হলে তা পুনরুদ্ধারের জন্য জিহাদ ফরয করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।[৫]

অতএব, ইসলামে মানবাধিকার হলো কুরআন ও হাদীসে যেসব অধিকার মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। এগুলো ইসলামী চিন্তাধারা, আল্লাহর ইবাদত ও মানুষের স্বভাবজাত।[৬]

২. **অধিকারগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ** : ইসলামে মানবাধিকারসমূহ মহান আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে দান করা হয়েছে। এগুলো সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অনুগ্রহ। তিনি যেগুলোকে অধিকার হিসেবে গণ্য করেছেন সেগুলো দান করেছেন আর যেগুলো অধিকার

---

৫. আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

৬. ড. মুহাম্মদ জুহাইলী, *হুকুকুল ইনসান ফিল ইসলাম*, বৈরুত : দারু ইবনি কাছীর, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১৩২-১৩৩

নয় বলে গণ্য করেছেন সেগুলো নিষেধ করেছেন। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত। মানুষের ভাল মন্দ সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।[৭]

৩. **ইসলামে মানবাধিকার সবধরনের অধিকারকে শামিল করে :** ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সব ধরনের অধিকারকে মানবাধিকারে শামিল করে। এসব অধিকার ইসলামী শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকল মানুষের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলভেদে কোন পার্থক্য নেই।

৪. **ইসলামের মানবাধিকার চিরন্তন :** ইসলামে মানবাধিকারসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন। কখনও এগুলো পরিবর্তন হয়না। কেননা এসব অধিকার ইসলামী শরী'আতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৮] মানবরচিত আইন অবস্থাভেদে পরিবর্তন-পরিমার্জন হয়, কিন্তু আল্লাহর আইন চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল।

৫. ইসলামে মানবাধিকার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়, বরং শরীআতের উদ্দেশ্য পরিপন্থী না হয়ে যেসব অধিকার ভোগ করা যায় এবং যেগুলো অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষতি করেনা সেগুলোই মানবাধিকার।[৯]

ইসলাম ও পাশ্চাত্য মানবাধিকারের পার্থক্য

বলাবাহুল্য যে, পাশ্চাত্য ও ইসলামী মানবাধিকারে সংজ্ঞায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য মানবাধিকার মাত্র ১৯৪৮ সালে রচিত, অন্যদিকে ইসলামের মানবাধিকার আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগের। বরং মানবতার ঊষালগ্ন ইসলামের প্রথম নবী আদম আ. থেকেই ইসলামের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে বলা যায়, যেসব চিন্তা-গবেষণা ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হলো:

১- শুধু আকল বা বিবেকই হলো অধিকার ও স্বাধীনতার মূল মাপকাঠি। যদিও এ আকল দীনের কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করে। একমাত্র আকলই এসব মূল্যবোধ গ্রহণ ও বর্জন করার ক্ষেত্রে বিচারক।

২- ধর্মনিরপেক্ষতা : জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখা হলো একমাত্র পদ্ধতি, যা এসব অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংগঠিত করবে।

---

৭. ড. সুলাইমান হুকাইল, হুকূকুল ইনসান ফিল ইসলাম ওয়াররাদ্দু 'আলাশ শুবহাতিল মুসারা হাওলাহা, রিয়াদ : ফাহরাসাত মাকতাবা মালিক ফাহাদ আল ওয়াতানিয়া, চতুর্থ সংস্করণ ২০০৩ খ্রি., পৃ. ৫৩

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

৩- 'স্বাধীনতা' ও 'সম-অধিকার' হলো সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। সমাজের অন্যান্য মূল্যবোধ এর অধীনে ও এর সাথে সংগঠিত হবে। এদুটো হলো 'স্থায়ী' ও 'মহাপবিত্র' বিষয়, এর কোন পূর্বসংস্কার করা যাবে না।

৪- ব্যক্তি জীবনে সুখ শান্তির জন্য তাকে মূল্যায়ন ও স্বার্থসমূহকে অনুমোদন করা হবে, যতক্ষণ সমাজের ভূমিকা ও স্বার্থের সাথে বিরোধ না হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী পটভূমি ও ব্যবস্থাপনায় এ শব্দাবলি ও পরিভাষাগুলোর অর্থ কিছুটা আলাদা। ইসলামে ও ইসলামী সমাজে মানবাধিকার ও এর আইন হলো:

১- 'শুধু বিবেক' ও 'ইন্দ্রীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার' বিপরীতে ইসলামে 'ওহী' হলো মূল্যবোধ ও মূলনীতির সর্বোচ্চ মাপকাঠি, যা থেকে স্থায়ী ও পবিত্রতম বিষয়গুলো নিসৃত হয়। তবে বিবেক ও ইন্দ্রীয় জ্ঞানের ভূমিকাকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে অবজ্ঞা করা হয় না।

২- 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বিপরীতে ইসলামে 'শরীআত ও দীনের' সাথে দুনিয়ার কাজ কর্মের ধারাবাহিক সামঞ্জস্য হলো একমাত্র পদ্ধতি, যার উপর ভিত্তি করে সমাজ চলে।

৩- 'স্বাধীনতা' ও 'সমানাধিকারের' বিপরীতে ইসলামে রয়েছে আল্লাহর জন্য 'ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice)। এ দুটো হলো ইসলামী সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, এগুলো বাস্তবায়ন করা হয়; তবে সংস্কার করা যায় না। এদুটোর অবস্থান সর্বাগ্রে, এর জন্য সমাজের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ ও এর সাথে সংগঠিত করা হয়।

৪- ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীতে ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ রয়েছে। একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় না করে পরস্পরের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করা করা।

৫- অন্যদিকে ইসলাম ও প্রচলিত আইনে মানবাধিকার লংঘনে শাস্তির মধ্যেও রয়েছে বিশাল পার্থক্য। যেমন, কোন মুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে হত্যার বিধান প্রচলিত আইন সমর্থন করে না। আবার হত্যার পরিবর্তে হত্যাও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো অস্বীকার করে। তারা এটাকে অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন মনে করে। এমনিভাবে বিবাহিত ব্যক্তির যিনার শাস্তি ইসলামে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা, কিন্তু প্রচলিত আইনে এটাকে নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সব অপরাধের মূলোৎপাটন করতেই কিছুটা কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে, যা মানুষের পক্ষে গভীর চিন্তা ভাবনা ছাড়া বুঝা অসম্ভব। সমাজ থেকে সব অন্যায় অবিচার দূর

করাই ইসলামের সব শাস্তির মূল লক্ষ্য। এ কারণেই কিসাসের বিধান শেষে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[১০]

মানবাধিকারের প্রকারভেদ

জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলোঃ (ক) সমতা ও মর্যাদার অধিকার, (খ) নাগরিক অধিকার, (গ) রাজনৈতিক অধিকার, (ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার, (ঙ) সামাজিক অধিকার ও (চ) সাংস্কৃতিক অধিকার।[১১]

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে নাগরিক অধিকারসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। আর নাগরিক অধিকারসমূহ হলোঃ

১- জীবনের অধিকার, ২- স্বাধীনতার ও দাস না হওয়ার অধিকার, ৩- আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার, ৪- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার, ৫- আদালতে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার, ৬- অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার, ৭- অন্যায়ভাবে আটক বা নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার, ৮- গোপনীয়তার অধিকার, ৯- অভিবাসনের অধিকার, ১০- আশ্রয়ের অধিকার, ১১- পরিবার গঠনের অধিকার, ১২- সম্পত্তির অধিকার।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে নাগরিক অধিকার ও ইসলামে নাগরিক অধিকারসমূহ

নিম্নে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ও ইসলামের নাগরিক অধিকার সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। সাথে সাথে এদুয়ের মধ্যে তুলনা করা হলো এবং পরিশেষে দেখা যাবে, ইসলাম প্রদত্ত নাগরিক অধিকারসমূহ সর্বজনীন ও সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

১- জীবনের অধিকার

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

Article 3:

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

অনুচ্ছেদ-৩:

প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।[১২]

---

১০. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯

১১. এ. এইচ. এম. আমিনুর রহমান, *জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি*, সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট-ডি, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৌষ ১৪১৩/ ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৯৮

OIC এর Cairo Declaration-এ জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ক) জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত এক নিয়ামত এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধানের অধিকার ইসলাম স্বীকৃত। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য-এ অধিকারকে যে কোন প্রকারে অবমাননা থেকে রক্ষা করা। শরীয়াহ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

খ) এমন কোন কাজ করা বা উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, যা মানবজাতির ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ) স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারো জীবন রক্ষা করা শরীয়াহ্ নির্দেশিত একটি কর্তব্য।

ঘ) শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত, এ নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরীয়াহ্ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।[১৩]

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে খুব কঠোরতা ও সাবধানতা অবলম্বন করেছে, যাতে কেউ অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে না পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

---

১২. Universal Declaration of Human Rights.
http://www.un.org/en/documents/udhr/

১৩. THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM (কায়রো ঘোষণা), ধারা : ২
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾

আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয় সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।[১৪]

কেউ অন্যকে হত্যা করলে তার বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান রয়েছে, যাতে কেউ হত্যার মত জঘন্য পাপকাজ করতে সাহস না করে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।[১৫]

দুনিয়ার শাস্তির সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির কথাও কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ারির সাথে উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।[১৬]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ.....

সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষকে হত্যা করা... ।[১৭]

---

১৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

১৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৮-১৭৯

১৬. আল-কুরআন, ৪: ৯৩।

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা, ওয়া মান আহইয়াহা..., বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৬৪৭৭

রাসূলুল্লাহ স. আরো বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

কোনো মু'আহাদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[১৮]

রাসূলুল্লাহ স. সকল মানুষকে সম্বোধন করে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُم

নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পরের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র, যেরূপ তোমাদের এই দিন পবিত্র তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ শহরে।[১৯]

আত্মহত্যাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করেছে। কুরআনে এসেছে,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।[২০]

আত্মহত্যার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সাবিত ইবন যাহ্হাক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দীনের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে, সে যেমন বলল তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।[২১]

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

---

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জিযইয়া ওয়াল মুযাদা'আহ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান কতালা মু'আহাদান বি-গাইরি জুরমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৯৫

১৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-'ইল্ম, পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স., রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামি'ইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৭

২০. আল-কুরআন, ৪ : ২৯

২১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কতিলিন নাস্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯৭

যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শাবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেই নিজেকে বর্শাবিদ্ধ করে শাস্তি দিতে থাকবে।[২২]

শিশুকে রক্ষা করা, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা, তাদেরকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেয়া, কঠিন পরিশ্রমের কাজে তাদেরকে না লাগানো, তাদেরকে ভালোবাসা, শিশু হত্যা বন্ধ করা ইত্যাদি ইসলামের অমোঘ বিধান। আল্লাহ বলেছেন,

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।[২৩]

শিশুর দুগ্ধ পান ও লালন পালনের অধিকার সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।[২৪]

শিশু হত্যা মহাপাপ। এসম্পর্কে কুরআনে এসেছে ,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?[২৫]

২- স্বাধীনতার ও দাস না হওয়ার অধিকার

Article 4:

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

অনুচ্ছেদ-৪:

কাউকে দাস হিসেবে বা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে।

---

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জানায়িয, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কতিলিন নাস্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৯৯

২৩. আল-কুরআন, ১৮ : ৪৬

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

২৫. আল-কুরআন, ৮১ : ৮-৯

কায়রো ঘোষণাতে বলা হয়েছে:

Article-11

(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

ধারা: ১১

ক) প্রতিটি মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। কাউকে দাসত্বে আনা, লাঞ্ছনা বা অবমাননা করা, শোষণ করা বা তাকে হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে বশ্যতা স্বীকারে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

খ) দাস প্রথার সবচেয়ে কুৎসিত রূপ হিসেবে পরিগণিত সব ধরনের উপনিবেশিকতা সম্পর্ণ নিষিদ্ধ। উপনিবেশিকতার শিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বীয় লক্ষ্য নির্ধারণের অধিকার। প্রতিটি রাষ্ট্র ও জনগণের কর্তব্য, এসব মানুষকে তাদের যাবতীয় ঔপনিবেশিক কুপ্রভাব এবং দখলদারিত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার সংগ্রামে সমর্থন যোগান। দুর্দশাগ্রস্ত এসব দেশ ও জনগণের অধিকার রয়েছে তাদের স্বকীয় পরিচয় সংরক্ষণ ও তাদের সমস্ত বিত্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাকে দাস বানানো যাবে না। যে জাতি নিজের স্বাধীনতার সংগ্রাম করে, তার জন্য সাহায্য করা সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজের কর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যা পালনে কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই।[২৬]

---

২৬. ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর-রিযকী, *মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি*, অনুবাদ : হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল আইড বাংলাদেশ, পৃ. ৫৪

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে (স্বাধীনভাবে বাস করার) ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।[২৭]

মানুষের প্রকৃত রূপ হলো, সে মাটি থেকে সৃষ্ট, তাকে গর্ব অহঙ্কার দূর করতে হবে, সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে, এতে নারী পুরুষ কাউকে বিশেষত্ব দেয়া হয়নি, বরং সবারই গন্তব্য হলো মাটি। প্রকৃত পার্থক্য হলো তাকওয়া অবলম্বন। যে ব্যক্তি মুত্তাকি সেই সফলকাম। কুরআনে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[২৮]

'উমর রা. বলতেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রা. বলতেন, "আবূ বকর রা. আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল রা. কে"।[২৯]

৩- আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার

Article 6:

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

অনুচ্ছেদ-৬:

আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

---

২৭. আল-কুরআন, ২২ : ৪১

২৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

২৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবা, পরিচ্ছেদ : মানাকিবু বিলালিবনি রাবাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৪৪

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلاَلًا»

Article 7:

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

অনুচ্ছেদ-৭:

আইনের কাছে সকলেরই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণাপত্রের লঙ্ঘনজনিত বৈষম্য বা এরূপ বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে।

কায়রো ঘোষণায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

Article 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

ধারা-১৯

ক) শাসক এবং শাসিত নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান।

মানবাধিকারের মূলে রয়েছে ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সবার সমানাধিকার। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইসলাম ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। ইসলামের বিধানের সামনে সবাই সমান। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩০]

অন্যদিকে নারী পুরুষ যেই অন্যায় করবে, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে তাদের উভয়কেই সমানভাবে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে।[৩১]

---

৩০. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৩১. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।[৩২]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত যে, উসামা রা. জনৈকা মহিলার ব্যাপারে নবী স. এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন,

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কারণ তারা আতরাফ (নিম্নশ্রেণীর) লোকদের উপর শরী'আতের শাস্তির বিধান কায়েম করত। আর শরীফ লোকদেরকে রেহাই দিত। ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এ কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৩৩]

৪- নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার

Article 5:

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

অনুচ্ছেদ-৫:

কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগে বাধ্য করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণায় বলা হয়েছে,

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

ধারা: ২

ঘ) শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত, এ নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরীয়াহ নির্দেশিত কোন কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।

ইসলামে অভিযুক্ত তো দূরের কথা, অপরাধীকেও অবৈধভাবে দৈহিক নির্যাতন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

---

৩২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

৩৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : ইকামাতিল হুদূদ 'আলাশ-শারীফ ওয়াল ওযী', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪০৫

إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি দিবেন।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে।[৩৫]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ، لا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

জেনে রাখ, প্রত্যেক অপরাধী নিজেই তার অপরাধের পরিণাম ভোগ করবে। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।[৩৬]

এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী হলো,

﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।[৩৭]

৫- জাতীয় আদালতে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

Article 8:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

অনুচ্ছেদ-৮:

যে কার্যাদির ফলে শাসনতন্ত্র বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌল অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয় বিচার আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

---

৩৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিরর ওয়াসসিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : ওয়া'য়ীদ আশ-শাদীদ লিমান ইউয়াযযিবুন নাস বিগাইরী হাক, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৬৮২৪

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল- ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল-মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০

৩৬. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : লা ইয়াজনি আহাদুন আলা আহাদ, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২০৪; হাদীসটির সনদ সহীহ।

৩৭. আল-কুরআন, ৫২ : ২১

কায়রো ঘোষণার ধারা -১৯-এ বলা হয়েছে,

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

খ) ন্যায়বিচার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য।

ইসলাম শুধু সৎ ও ন্যায় মানুষের অধিকারই দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং একজন অপরাধীকেও প্রাপ্তব্য মানবাধিকার দিয়েছে। অপরাধীকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেছে বরং তার পাপকে ঘৃণা করতে বলা হয়েছে। তাকে ভালো হওয়া ও শোধরানোর সুযোগ দিয়েছে। তওবার দরজা খোলা রেখেছে। তার উপর জুলুম করা যাবে না। কুরআনে এসেছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।[৩৮]

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾

কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে।[৩৯]

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতিব ইবন আবী বালতা'আ রা. নামে একজন সাহাবী তার পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার জন্য একজন বৃদ্ধা নারীর হাতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে গোপনে একটি চিঠি পাঠান। এতে রাসূলুল্লাহ স. এর যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা উল্লেখ ছিল। মহানবী স. বিষয়টি অবহিত হয়ে আলী রা., যুবায়ের রা. ও মিকদাদ রা. কে সে বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠান। তাঁরা পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তখন হাতিব রা. কে তলব করে প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাযির করা হলো। তিনি অত্যন্ত লজ্জা সহকারে নম্রভাবে বিনীত কণ্ঠে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাফের ও মুরতাদ কোনটাই হইনি। বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে আমি এ কাজ করিনি। আমার সন্তানেরা মক্কায় রয়েছে। সেখানে আমার সহায়তাকারী কোন গোত্র নেই। পত্রটি আমি কেবল এজন্যই লিখেছি যে, কুরাইশরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার করে অন্তত আমার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে না। স্পষ্টত এটা প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার। এ পত্র কুরাইশরা পেলে মুসলমানদের এ যুদ্ধের গোটা পরিকল্পনা ওলট-পালট হয়ে যেতো। সময়ের প্রেক্ষাপটে অপরাধের গুরুত্ব

---

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৩৯. আল-কুরআন, ৫ : ২

অনুধাবন করে উমর রা. ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, এ বিশ্বাসঘাতকের গর্দান উড়িয়ে দেই"। কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. কোমল কণ্ঠে বললেন, উমর! হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী।[৪০]

হাতিব রা.-এর এ মুক্তি একদিকে মানব প্রাণের মর্যাদা, অপরদিকে মারাত্মক অপরাধের প্রকাশ্য আদালতে শুনানী ও অপরাধীর সাফাই এর সুযোগ দানের নযীরবিহীন ঘটনা। পৃথিবীর কোন সরকার না এই ধরনের অপরাধীকে কখনো প্রকাশ্য আদালতে হাযির করত, আর না কোন আদালত এরূপ মারাত্মক অপরাধ ও অপরাধীকে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি মূলক যবানবন্দীর পর মৃত্যুদণ্ডের চাইতে কম শাস্তি দিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. হাতিব রা. -এর অতীত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তার বর্ণনার সত্যতা বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা; কোন সাধারণ শাস্তিও দেননি।

৬- অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার

Article 9:

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

অনুচ্ছেদ-৯:

কাউকে খেয়াল খুশীমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না।

---

[৪০] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল ফাত্হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০২৫

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا لَهَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ يَقُولُ كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ }

কায়রো ঘোষণার ধারা-২০ এ বলা হয়েছে,

> It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him.

বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়।

নবী স. ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে বহু ঘটনা রয়েছে যা সাক্ষ্য বহন করে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কোন নাগরিককে যথারীতি মামলা পরিচালনা ও অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে বন্দী রাখা যায় না। "একবার রাসূলুল্লাহ স. মসজিদে নববীতে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণ চলাকালে একলোক দাঁড়িয়ে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশীকে কোন অপরাধে বন্দী করা হয়েছে? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি ভাষণ দিতেই থাকেন। এবারেও লোকটির প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার লোকটি দাঁড়িয়ে তার প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করলো। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও"।[৪১]

রাসূলুল্লাহ স.-এর দু'বার নীরব থাকার কারণ ছিল, শহরের প্রধান পুলিশ অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রেফতারকৃত লোকটির কোন অপরাধ থাকলে তিনি দাঁড়িয়ে তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু তার নীরবতার দরুন মহানবী স. বুঝতে পারলেন যে, লোকটাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাই তিনি তাকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।

উমার রা.-এর যমানায় ইরাক থেকে এক লোক এসে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি যার না আছে আগা, না আছে গোড়া। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কী? সে বলল, আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের বেসাতি চলছে। উমার রা. অবাক হয়ে বললেন, কী বল, এই জিনিস শুরু হয়ে গেছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চিত থাকো, আল্লাহর শপথ! ইসলামী রাষ্ট্রে কাউকে বিনা বিচারে আটক করা যায় না।[৪২]

---

৪১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়া, পরিচ্ছেদ : আল-হাবসু ফিদ-দীন ওয়া গায়রিহ্, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৩৬৩৩

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ -: إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ»

৪২. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আকদিয়া, পরিচ্ছেদ : আশ-শাহাদাত, মুয়াস্‌সাসাতু যায়দ বিন সুলতান আলি নাহিয়ান, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ২৬৬৬

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّهُ: «قَدِمَ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلاَ ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟. قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ».

এ হাদীস থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামে উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে কোন সরকার কোন নাগরিককে শাস্তি দিতে পারে না, আর পারে না তাকে বন্দী করে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে।[৪৩]

৭- অন্যায়ভাবে আটক বা নির্বাসিত না হওয়ার অধিকার

Article 10:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

অনুচ্ছেদ-১০ :

প্রত্যেকেরই তার অধিকার ও দায়দায়িত্বসমূহ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত যে কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিরূপণের জন্য পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে ন্যায্যভাবে ও প্রকাশ্যে শুনানী লাভের অধিকার রয়েছে।

Article 11:

(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

অনুচ্ছেদ-১১ :

ক) কোন দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হলে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেয়া, এমন গণ-আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

---

৪৩. সালাহুদ্দীন, *মৌলিক মানবাধিকার*, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ২১৫

খ) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয় থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে বেশী শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৯ এ বলা হয়েছে,

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

ঙ) নিরপেক্ষ বিচারের বা শুনানির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ। এ নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ায় বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে।

ধারা-২০ এ বলা হয়েছে,

It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him.

বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা বা কেড়ে নেয়া, তাকে নির্বাসিত করা বা কয়েদ করা অথবা তাকে শাস্তি দেয়া অনুমোদিত নয়।

আদালতে তাকে আত্মপক্ষ অবলম্বন ও স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছে। কাউকে অপরাধী বলা মানেই সে অপরাধী হয়ে যায় না। হতে পারে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ। তাই তাকে নির্দোষ প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে। অপরাধীর শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর গর্ভের ভ্রূণের অধিকারটিও দিতে কার্পণ্য করেনি। অপরাধীকে ভর্ৎসনা না করে তার জন্য কল্যাণ কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছে। যতদূর সম্ভব মুসলিম নাগরিককে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়ার চেষ্টা করা, সুযোগ থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়া। কাউকে মুক্তি দিতে ভুল করার চাইতে শাস্তি দিতে ভুল করাই বিচারকের জন্য শ্রেয়। এসব আদর্শ নিম্নোক্ত হাদীসে দেখতে পাই,

সুলাইমান ইবন বুরায়েদ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মায়েয ইবন মালিক নবী স. এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি অল্পদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী স. আগের মতই কথা বললেন, যখন চতুর্থবার মায়েয একই কথা বললো, তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, কোন (বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বললো, ব্যাভিচার হতে। সূতরাং রাসূলুল্লাহ স. তার (সঙ্গী সাথীদের নিকট) জিজ্ঞাসা করলেন, তার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে। তখন

তাঁকে জানানো হল যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি মদ্যপান করেছে। তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং তার মুখ শুকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর রাসূলুল্লাহ স. ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? প্রতি উত্তরে সে বললো, জী হ্যাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ স. তার প্রতি (ব্যভিচারের শস্তি প্রদানের) নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। সুতরাং এ ব্যাপারে জনগণ দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সে (মায়েয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তার পাপ কার্যত তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মায়েয এর তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবার অনুশোচনা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী স. এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তার হাতের উপর রাখলো। এরপর বললো আমাকে পাথর দ্বারা হত্যা করুন। বর্ণনা কারী বলেন, "দু-তিন দিন পর্যন্ত মানুষ কেবল এ কথাই বলাবলি করছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ স. আগমন করলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সাহাবীগণ বসে আছেন। তিনি প্রথমে সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মায়েয ইবন মালিক এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তখন তারা বললেন, আল্লাহ মায়েয ইবন মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন, সে এমনভাবে তাওবা করেছে যে, যদি তা কোন সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে বন্টন করা হয়, তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর নিকট আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য। তুমি প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। তখন মহিলা বললো, আপনি ইচ্ছা করছেন যে, আমাকেও আপনি তেমনিভাবে ফিরিয়ে দিবেন- যেমনিভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়েয ইবন মালিককে? তখন তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে। মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি স্বেচ্ছায় তা করেছ। সে প্রতি উত্তরে বলল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী স. এর নিকট এসে বলছেন, গামেদীয় মহিলা তার সন্তান প্রসব করেছে। তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোট শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে রজম করতে পারিনা। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করানোর মত কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি তাকে পাথর-নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন।"[৪৪]

---

[৪৪] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : মানি' তারাফা 'আলা নাফসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫২৭

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ স. মায়েয রা. কে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা করেছেন। মায়েযের যবানবন্দী ও তার গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদানের বেলায় তিনি এমন কোন কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন, যার দরুণ তার জীবন বাঁচানো যেতে পারে। তিনি মদ পানের নেশা বা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণও অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পেয়ে চূড়ান্ত রায় দেন।[৪৫]

আব্বাসী আমলের প্রধান বিচারপতি কাযী আবু ইউসুফ রহ. আটকাদেশ সম্পর্কে বলেন,

> কেউ কোন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তার ভিত্তিতে তাকে জেল হাজতে চালান দেয়া জায়িযও নয় এবং জায়িয হওয়ার কোন অবকাশও নেই।[৪৬] রাসূলুল্লাহ স. শুধু অভিযোগের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করতেন না। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে বাদী-বিবাদী উভয়কে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। বাদীর কাছে কোন সঙ্গত প্রমাণ থাকলে তার পক্ষে রায় দিতে হবে নতুবা বিবাদীর নিকট থেকে জামানত নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি এরপরে বাদী কোন প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তো বেশ, অন্যথায় বিবাদীর সাথে বিরূপ ব্যবহার করা যাবে না।[৪৭]

৮- গোপনীয়তার অধিকার

Article 12:

> No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، .. إلخ

৪৫. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৪৬. তবে জুমহুর ফকীহগণের মতে, অবস্থাভেদে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা জায়িয। তবে এটা সঠিক যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি দুরাচারী হিসেবে সমাজে পরিচিত না হয় এবং অভিযোগের পক্ষেও যদি কোনো শক্তিশালী আলামত পাওয়া না যায়, তা হলে তাকে কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করে রাখা জায়িয নেই। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি সদাচারী না-কি দুরাচারী, তা যদি জানা না যায়, তা হলে অধিকাংশ ফকীহের মতে, তাকে তার সাধারণ নৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা জায়িয। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ, চোর ও খুনী ইত্যাদি অপরাধী হিসেবে পরিচিত হয়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা জায়িয তো বটেই; বরং শ্রেয়। (ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ*, পৃ. ১০১-১০৪; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১৫, পৃ. ২৯৪)

৪৭. ইমাম আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.১৯০-১

অনুচ্ছেদ-১২ :

কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৮ এ বলা হয়েছে,

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

খ) প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়িতে, নিজ পরিবারে, নিজ সম্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিরূপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তির উপর গুপ্তচরবৃত্তি, তাকে নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে।

কারো সম্মানহানীকর কিছু করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। কারো গোপনীয় ব্যাপারে নাক গলানো যাবে না। কাউকে উপহাস ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যকর কিছু বলাও হারাম করেছে। পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট। আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।[৪৮]

---

৪৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০-১১

হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ، وَلا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পর ধোঁকাবাজী করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ-করো না, একে অপরের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচা-কেনার চেষ্টা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং হেয় করবে না। তাকওয়া এইখানে, এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ স. তিনবার তার বুকের প্রতি ইশারা করলেন। একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে হেয় করে। কোন মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল ও ইযযত-আবরু হারাম।[৪৯]

৯- জাতীয়তা ও অভিবাসনের অধিকার

Article 13:

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

অনুচ্ছেদ-১৩ :

ক) নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

Article 15:

(1) Everyone has the right to a nationality.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

অনুচ্ছেদ-১৫ :

ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

---

৪৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুস যুলমিল মুসলিমি ওয়া খাযলিহী..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫২৭

কায়রো ঘোষণার ধারা-১২ তে বলা হয়েছে,

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country.

ধারা: ১২

শরীয়াহ্-নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ইসলামে জাতীয়তা ও অভিবাসনের অধিকার নিম্নোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় ,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্যও, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী।[৫০]

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্থানান্তর, নিজ জন্মস্থান থেকে অন্যত্র হিজরত করা, স্থায়ীভাবে অভিবাসী হওয়া এবং পুনরায় জন্মস্থানে ফিরে আসার অধিকার দিয়েছে। এতে তাকে কোন রকম বাঁধা দেয়া বা হয়রানী করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেছেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান। [৫১]

আল্লাহ আরো বলেছেন

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।[৫২]

---

৫০. আল-কুরআন, ৫৯ : ৮

৫১. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

৫২. আল-কুরআন, ৪ : ৯৭

কাউকে তার দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা বা তাড়িয়ে দেয়া জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ বলেছেন ,

﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

বল, 'তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান, তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়।[৫৩]

ইসলামে দু'ধরনের নাগরিকত্ব রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম জাতি ও জিম্মি তথা অমুসলিম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। মুসলিমরা স্থায়ী বাসিন্দা হোক বা অভিবাসী হোক সবাই একে অপরের বন্ধু। কিন্তু এ ধরনের বন্ধুত্ব আন্তর্জাতিক সনদে উল্লেখ নেই। আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে।[৫৪]

ইসলাম শুধু মুসলিমকেই নিরাপত্তার অধিকার দেয়নি, বরং অমুসলিমকেও ন্যায়বিচার, ধর্ম পালন, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছে। অমুসলিমের সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন,

﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যালিম।[৫৫]

---

৫৩. আল-কুরআন, ২ : ২১৭

৫৪. আল-কুরআন, ৮ : ৭২

৫৫. আল-কুরআন, ৬০ : ৮-৯

অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি চুক্তিকারীর উপর যুলুম করবে বা চুক্তি ভঙ্গ করবে, বা তাঁর সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিবে বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া বেশী নিবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবো।[৫৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সাথে কোন চুক্তি করলে তা পূরণ করা এবং তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণে কার্পণ্য না করা ওয়াজিব। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা চুক্তিকারীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।[৫৭]

বকর ইবন ওয়াইল গোত্রের এক লোক উমর রা.-এর যুগে এক জিম্মিকে হিরা নামক স্থানে হত্যা করলে তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে নির্দেশ দেন। তাকে (হত্যাকারীকে) তাদের হাতে তুলে দিলে তারা (নিহতের অভিভাবকরা) তাকে হত্যা করে ফেলে।[৫৮]

পক্ষান্তরে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুর এ ধরনের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক কোন সনদই দিতে পারেনি। একমাত্র ইসলামই সব অমুসলিমের জাতীয়তা ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

১০- আশ্রয়ের অধিকার

Article 14

(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

---

৫৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : তা'শীরু আহলিয যিম্মাতি ইযাখতালাফূ বিত্তিজারাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৫৪ ; আল-আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫৭. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, পরিচ্ছেদ : মান কতালা মু'আহাদান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৮৬; হাদীসটির সনদ সহীহ।

৫৮. ইমাম বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, তাহকীক : মুহাম্মাদ 'আব্দুল কাদির 'আতা, মক্কা মুকাররমা : মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., হাদীস নং- ১৫৭০৬

أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.

(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

অনুচ্ছেদ-১৪:

নির্যাতন এড়ানোর জন্য প্রত্যেকেরই অপর দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও আশ্রয় লাভ করার অধিকার রয়েছে। অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে সত্যিকারভাবে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার নাও পাওয়া যেতে পারে।

কায়রো ঘোষণাতে ধারা-১২ তে বলা হয়েছে,

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.

শরীয়াহ্-নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরার, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে। আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তবে আশ্রয় প্রার্থনাকারী অবশ্যই শরীয়াহ নির্দেশিত কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

কায়রো ও আন্তর্জাতিক সনদের মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য হলো, কায়রো ঘোষণায় শরীয়াহ নির্দেশিত কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত না হলে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দেয়া যাবে। চাই তা রাজনৈতিক হোক বা অরাজনৈতিক। কিন্তু আন্তর্জাতিক সনদে অপরাধটা অরাজনৈতিক ও জাতিসংঘের মূলনীতি বিরোধী না হলেই আশ্রয় দেয়া যাবে।

ইসলাম প্রত্যেক মজলুম ও নির্যাতিত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার দিয়েছে, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। কোন অমুসলিম মুসলিমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾

আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে।[৫৯]

মক্কার মসজিদুল হারাম সকল মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কোন মানুষকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন সনদ বা আইনে সকল মানুষের জন্য এমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।[৬০]

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾

নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি।[৬১]

১১. পরিবার গঠনের অধিকার

Article 16:

(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

অনুচ্ছেদ-১৬ :

পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জাতিগত, জাতীয়তা অথবা ধর্মের কারণে কোন সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিবাহের ব্যাপারে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে তাদের সম-অধিকার রয়েছে। কেবল বিবাহ-ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির দ্বারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক এর সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

---

৫৯. আল-কুরআন, ৯ : ৬

৬০. আল-কুরআন, ৩ : ৯৭

৬১. আল-কুরআন, ২২ : ২৫

কায়রো ঘোষণাতে বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Article 5:

(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

ধারা: ৫

ক) সমাজের বুনিয়াদ হলো পরিবার এবং পরিবার গঠনের ভিত্তি হলো বৈবাহিক প্রথা। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার আছে। গোত্র, বর্ণ বা জাতীয়তার কারণে উদ্ভূত কোন প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদেরকে এ অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

খ) সমাজ এবং রাষ্ট্র বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করার দায়িত্ব নেবে এবং বৈবাহিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলবে। পরিবারের নিরাপত্তা বিধান ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ধর্মের বাঁধা উপেক্ষা করে যে কোন ধর্মের লোকই কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কায়রো সনদেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নেই। ইসলামে 'বিবাহ' কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয়, বরং পারস্পরিক ভালোবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একজন স্ত্রী শুধু দুনিয়ারই সঙ্গী নন, বরং পরকালেও সে জান্নাতে সাথী হবেন। দীনের বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা অপরিহার্য। সে জন্যই ইসলাম মুসলমানকে মুসলমানের সাথেই বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এর হিকমত সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾

আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয় উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান

আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।[৬২]

বিবাহ-শাদীকে আল্লাহর একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে আখ্যা করা হয়েছে এবং একে আত্মার প্রশান্তির মাধ্যম বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[৬৩]

বিবাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

আর আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হল সে আমার আদর্শভুক্ত নয়।[৬৪]

তালাকের ক্ষেত্রেও ইসলামে রয়েছে সুন্দর বিধান। ইসলাম কোনভাবেই একটা সংসারকে ভেঙ্গে দিতে চায় না। সংসার টিকিয়ে রাখতে ইসলাম সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। কিন্তু কোনভাবেই যদি তা সম্ভব না হয় তবে তালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। কুরআনে এসেছে,

﴿وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার

---

৬২. আল-কুরআন, ২ : ২২১

৬৩. আল-কুরআন, ৩০ : ২১

৬৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আত-তারগীব ফিন-নিকাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭৭৬

থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।[৬৫]

তালাকের পরে নারী পুরুষ উভয়কে পুনঃবিবাহ বন্ধনের অনুমতি দিয়েছে।

১২- সম্পত্তির অধিকার

Article 17:

(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.

অনুচ্ছেদ-১৭:

প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়াল-খুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না।

কায়রো ঘোষণার ধারা-১৪ ও ১৫ তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

Article -14

Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগের অধিকার সবার রয়েছে। তবে তা যেন স্বেচ্ছাচারমূলক বা প্রতারণামূলক না হয় এবং তাতে নিজের বা অন্যের কোন রূপ ক্ষতি সাধিত না হয়। সূদ নেয়া বা দেয়া সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ।

Article -15

(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

ক) বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পত্তির ওপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে এবং নিজের, অন্যদের বা সাধারণভাবে সমাজের অন্য সদস্যদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন না করে এ সম্পত্তি ভোগ-দখলের যাবতীয় অধিকার তার রয়েছে। জনস্বার্থে দখলীকৃত জমি বা সম্পত্তির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তিসঙ্গত মূল্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। অন্যথায় কাউকে তার নিজ জমি বা সম্পত্তি থেকে দখলচ্যুত করা যাবে না।

---

৬৫. আল-কুরআন, ৪ : ৩৪-৩৫

ইসলাম পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কোনটিকেই পুরোপুরি সমর্থন করে না। ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা খুবই নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজে সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। ধনীদের উপর সম্পদে দান সদকা, যাকাত ইত্যাদি কর্তব্য পালন করতে হয়। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।[৬৬]

ইসলাম সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে। নিজে চাষ না করতে পারলে অন্যকে দিয়ে চাষ করাতে আদেশ দিয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

যার নিকটে জমি আছে সে যেন তা নিজেই চাষ করে। আর সে যদি নিজে চাষ না করে, তাহলে যেন তার অন্য ভাইকে চাষ করতে দেয়।[৬৭]

ইসলাম শুধু নারী পুরুষকেই সম্পত্তিতে অধিকার দেয়নি; বরং পেটের ভ্রূণ ও নবজাতককেও সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে। এতে ছেলে মেয়ে কাউকে পার্থক্য করেনি। সবাই অংশহারে সম্পত্তির মালিক হবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।[৬৮]

ইসলামের যাবতীয় কাজেই রয়েছে মানবতা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি একজন মৃতব্যক্তিকেও কিভাবে সম্মানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়া হবে সে ব্যাপারেও ইসলাম মানবতা দেখিয়েছে। পশ্চিমাদের মানবতা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সাল থেকে আর ইসলামের মানবতা শুরু হয়েছিল আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগ থেকে। ইসলাম প্রত্যেককেই তার অধিকার ন্যায্যভাবে দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামী শরী'আহর বাস্তবায়ন না থাকায় ইসলামের উদারতাগুলো আড়ালে লুকিয়ে আছে। মানবতা আজ চিৎকার করছে একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায়, কিন্তু যারাই আজ মানবতার বুলি আওড়াচ্ছে তাদের দ্বারাই মানবতা বেশি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। একমাত্র ইসলামই পারে বিশ্বকে মুক্তির বাণী শুনাতে,

---

৬৬. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বয়ূ', পরিচ্ছেদ : কিরাইল আরয্‌, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৯৯৮

৬৮. আল-কুরআন, ৪ : ১১

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সর্ব ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে, মানবতার জয়গান গাইতে, নারীর মর্যাদা ও মুক্তি দিতে, শ্রম ও শ্রমিকের ন্যায্য মূল্য দিতে, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার অধিকার নিশ্চিত করতে, মুসলিম অমুসলিম সবার সমান অধিকার দিতে। ইসলামী সমাজে শান্তিপ্রিয় মানুষের যেমন কদর, তেমনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর কঠোর সাজা। এটাই ইসলাম। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

তবে ইসলাম ও প্রচলিত মানবাধিকারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, যা নাগরিক অধিকার আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে। মানবাধিকার সনদকে কারো মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া চলবে না। অনুচ্ছেদ- ৩০ এ বলা হয়েছে, এই ঘোষণার উল্লিখিত কোন বিষয়কে এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা চলবে না, যাতে মনে হয় যে, এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত কোন অধিকার বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তি বিশেষের আত্মনিয়োগের অধিকার রয়েছে।[৬৯]

পক্ষান্তরে ইসলামে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৭০]

উপসংহার

জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বেশ কিছু অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কেননা সে অধিকারসমূহ শুধু সরকার ও রাষ্ট্রসমূহের মুকাবিলায় চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত ঘোষণার প্রেক্ষিতে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ শুধু এতটুকু দাবীই করতে পারে যে, সে বাঁচার, স্বাধীনতা ভোগ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা-জাতীয়তা, প্রজন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ধন-সম্পদের পরিমাণ বা সামাজিক মৌলিকতা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদির দিক দিয়ে পার্থক্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার দিতে হবে। কিন্তু এ ঘোষণায় মানুষ হিসেবে তারই ভাই অপর মানুষের উপর তার অধিকার রয়েছে, সে বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখিত হয়নি। শুধু এতটুকুই

৬৯. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) থেকে সংগৃহীত http://www.un.org/en/documents/udhr/
৭০. আল-কুরআন, ৪ : ৫৯

বলে শেষ করা হয়েছে যে, "নাগরিকগণ পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃত্বের ভাবধারাপূর্ণ আচরণ করবে", অথচ আসল ব্যাপার হলো, মানুষের একজনের উপর অপরজনের যে অধিকার, রাষ্ট্র সরকারের উপর নাগরিকের অধিকারের তুলনায় তা অনেক বেশি গভীর ও ব্যাপক। বস্তুত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই মানব জীবনের সার নির্যাস। একারণেই কুরআন ও সুন্নাহ্ এ মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের কথা একই সাথে ব্যাপকভাবে ও শক্তিসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে যেমন পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্যের কথা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে সন্তানের অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। স্বামীর অধিকার ও কর্তব্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বলা হয়েছে স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্যের কথাও। ভাই ও নিকটাত্মীয়ের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথাও একই সাথে পাশাপাশি বলা হয়েছে। প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, গরীব-মিসকিন, ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক, শাসক-শাসিত প্রভৃতির পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় অধিকার ও কর্তব্যের যত দিক ও শাখা আছে তার কোন একটিও কুরআন ও সুন্নাহ্-এ বাদ পড়েনি।

জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার আরেকটি অসম্পূর্ণতা হলো, তাতে শুধু অধিকারের কথা বলা হয়েছে, কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা হয়নি। আর অধিকারের ব্যাপারটিকেও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে স্বাধীনতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ধর্মপালন ইত্যাদি মাত্র কয়েকটির মধ্যে। মানুষের অধিকারের সাথে কর্তব্য ও দায়িত্ব কোথায়? আমানতদারী রক্ষা, আমানতের জিনিস প্রকৃত মালিকের নিকট প্রতিশ্রুত সময়ে যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করা কি কর্তব্য নয়? মানুষের উপর তারই মত অন্য মানুষের কি কোন অধিকার নেই? অধিকার কি একতরফা? অপর লোকের সে অধিকার যথারীতি আদায় করা কি কর্তব্য নয়? সে কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলা না হলে মানবাধিকার কি একতরফা হয়ে যায় না?

মানুষকে ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কি মানুষের কর্তব্যভুক্ত নয়? কর্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, অসৎ পন্থায় মানুষের ধন-সম্পদ হরণ না করা, জুলুম থেকে বিরত থাকা, ধোঁকা না দেয়া, কাউকে না ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ না করা, মুনাফিকি না করা, মিথ্যা না বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া, উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া, নম্রতা, সহৃদয়তা, দয়ার্দ্রতা গ্রহণ, কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ না করা, কারো দোষ ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো, গিবত না করা, চোগলখুরী না করা, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো থেকে বিরত থাকা, এককথায় সব ভালো গুণে গুণান্বিত হওয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাও তো মানুষের কর্তব্য।[৭১]

---

৭১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২২-২৩

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজিঃ নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যেভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., পরিচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।
যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।
যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম (ইটালিক), তারিখ ও সাল, পৃ... ।
যেমন : *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www : ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।
(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।
(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।
(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।
(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।
(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।
(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।
(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: JANUARY-MARCH : 2015 :: Tk.100/-